খুলাফায়ে রাশিদীন

ইউনিট ৬

ভূমিকা

খিলাফত হচ্ছে একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইবনে-খালদুনের মতে, " খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মহানবী (সা:)- এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই কারণে খলীফার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা ।" মহানবী (সা:)- এর পর যারা তাঁর আদর্শ ও দাওয়াত প্রচারণার দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকে বলা হয় খলিফা। এই খলীফা ও খিলাফতকে ঘিরেই মুসলিমদের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে একদিকে যেমন ইসলামের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসার, ঠিক অপরদিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অপব্যবহার, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও সর্বোপরি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। মহানবী (সা:)- এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন শুরু হয় যা ছিল মূলত মহানবী (সা:)- এর শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারিত রূপ। পরবর্তীতে খিলাফত একটি ইহলৌকিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সঠিক পথে পরিচালিত চার জন শাসনকাল কখনোই পুরোপুরি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনকাল (৬৩২-৩৪) ছিল পুরোটাই রিদ্দা যুদ্ধে পরিপূর্ণ। হযরত উমর ফারুক (রা.) এর সময় (৬৩৪-৪৪) পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বিজিত হয় এবং সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠে। হযরত উসমান (রা.) এর শাসনকালের (৬৪৪-৫৬) প্রথম পর্ব ছিল শান্তি ও বিজয়ের যুগ কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিস্বার্থপরতা ও গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। শেষ খলীফা হযরত আলী (রা:) এর সময়ে (৬৫৬-৬১) মুসলিমগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ধর্মভিত্তিক খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র নির্ভর খিলাফতের আবির্ভাব ঘটে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এই ইউনিটে খুলাফায়ে রাশেদীনদের ক্ষমতায় আরোহণ, তাঁদের চরিত্র, কৃতিত্ব ও আনীত সংস্কারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ খলীফা ও খিলাফত
পাঠ-৬.২ ঃ হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ।
পাঠ-৬.৩ ঃ রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।
পাঠ-৬.৪ ঃ হযরত আবু বকর (রা.) এর বিজয় অভিযানসমূহ
পাঠ-৬.৫ ঃ হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনব্যবস্থা ও চরিত্র
পাঠ-৬.৬ ঃ হযরত উমরের (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ
পাঠ-৬.৭ ঃ হযরত উমরের বিজয় অভিযানসমূহ-
পাঠ-৬.৮ ঃ হযরত উমর (রা.) এর প্রশাসনিক সংস্কার
পাঠ-৬.৯ ঃ হযরত উমর (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৬.১০ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ
পাঠ-৬.১১ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ-
পাঠ-৬.১২ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ-৬.১৩ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৬.১৪ ঃ হযরত আলী (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত
পাঠ-৬.১৫ ঃ উষ্ট্রের যুদ্ধ
পাঠ-৬.১৬ ঃ সিফফিনের যুদ্ধ
পাঠ-৬.১৭ ঃ হযরত আলী (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ-৬.১৮ ঃ খুলাফায়েরাশেদীনের শাসনব্যবস্থা।

পাঠ-৬.১ খলীফা ও খিলাফত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলীফা ও খিলাফত সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
- খলীফা হওয়ার গুণাবলী ও নির্বাচন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**খলিফা, 'বায়াৎ', কুরাইশ বংশ, পরামর্শ সভা ও নির্বাচকমণ্ডলী**

খলীফা হচ্ছে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। খলিফাকে ঘিরেই মুসলিম শাসনব্যবস্থা আবর্তিত হয়। খলীফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর যিনি বা যারা তাঁর আদর্শকে বলবৎ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন তাদের বলা হয় খলীফা বা প্রতিনিধি। প্রধান চারজন খলীফা হলেন- হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.)। মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর এই চার জন প্রসিদ্ধ সাহাবী রাসূল (সা.) এর দেখানো পথ অনুসারে মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন, এরাই ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশিদীন নামে পরিচিত। খিলাফত হল ধর্মীয়-রাজনৈতিক একটি প্রতিষ্ঠান।

এক নজরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল

খলিফা	খিলাফতের সূচনা	সমাপ্তি	সময়কাল
হযরত আবু বকর (রা)	১৩ই রবিউল আউয়াল ১১হি.	২২ শে জমাদিউল উখরা ১৩হি.	২ বছর ৩ মাস ৯ দিন
হযরত উমর ফারুক (রা)	২৩শে জমাদিউল উখরা ১৩হি.	২৬শে যিলহজ্জ ২৩ হিজরি	১০ বছর ৬ মাস ৩ দিন
হযরত উসমান (রা)	১লা মুহাররম ২৪ হিজরি	১৮ই যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন
হযরত আলী (রা)	২৪শে যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১৭ই রমযান ৪০ হিজরি	৪ বছর ৮ মাস ২৩ দিন
হযরত ইমাম হাসান (রা)	২২শে রমযান ৪০ হিজরি	রবিউল আউয়াল ৪১ হিজরি	৬ মাস ৮ দিন

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান খিলাফত

ঐতিহাসিক মজীদ খাদ্দুরী বলেন, "খিলাফত হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান।" সুতরাং খিলাফত হচ্ছে মহানবী (সা.) এর আদর্শকে নেতৃত্বদানকারী এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। খলীফা হওয়ার জন্য অবশ্যই কিছু গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-কুরাইশ বংশোদ্ভুত, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, চারিত্রিক শুদ্ধতা, প্রজ্ঞাবান, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

খলীফা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি ছিল সর্বসম্মত ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বিশিষ্ট জ্ঞানী ও আলেম ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শসভার মাধ্যমে নির্বাচিত করা হতো। নির্বাচকমণ্ডলীর সুপারিশক্রমে কোন ব্যক্তি খলীফা নির্বাচিত হতেন এবং সবশেষে জনগণ কর্তৃক 'বায়াৎ' অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতো। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত খলীফা মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে যেতেন যা উমাইয়া যুগ থেকে রাজতন্ত্রে পরিণত হয়।

খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়। এ সময় কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে পূর্ণ ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হতো। কিন্তু উমাইয়া বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামের শাসননীতি ও আদর্শের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই প্রসংগে Syed Ameer Ali বলেন, The accession of the Ommeyades did not imply a change of dynasty; it meant the reversal of a principle and the birth of new factors. এ সময় হতে খিলাফত আমলের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক শাসন

কাঠামোর পরিবর্তে বংশানুক্রমিক ও রাজতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর সূত্রপাত ঘটে। এই সময় যে সমস্ত পরিবর্তন রাষ্ট্রের কাঠামো ও শাসননীতিতে প্রবেশ করে তা হলো-

রাজতন্ত্রের আবির্ভাব

মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের চারজন খলীফা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা.) ৬৭৬ খ্রিঃ তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূচনা করেন।

সারসংক্ষেপঃ

মহানবী (সা.) এর আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ছিল খিলাফত আর খলীফা ছিলেন তার কার্যনির্বাহক। আর খলীফা নির্বাচিত হতেন যোগ্যতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফা শব্দের অর্থ কী?
   ক) সর্বময় কর্তা খ) নেতা
   গ) প্রতিনিধি ঘ) মালিক

২. "খলীফা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি গণতান্ত্রিক" কেননা-
   ক) ঐতিহাসিকরা এটাকে গণতান্ত্রিক বলেন খ) এটি একটি নির্বাচন তাই
   গ) খলীফা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত ও জনগণ কর্তৃক আনুগত্য লাভ করেন
   ঘ) কোনটিই নয়

৩. খিলাফত হচ্ছে-
   i) খলীফার দপ্তর ii) জনসমাবেশ স্থল iii) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

নিচের কোন্‌টিসঠিক
   ক) i, ii খ) ii, iii গ) i, iii ঘ) i, ii, iii

৪. একজন মনীষীর ইন্তিকালের পর থেকে খিলাফতের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির ?
   ক) হযরত আবু বকর (রা) খ) হযরত আলী (রা)
   গ) হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘ) হযরত ওসমান (রা)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মোঃ জসীম উদ্দীন "যুবসংঘ" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি চলতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলে যান যে, যোগ্যতা অনুসারে গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সংঘের প্রধান নির্বাচিত করতে হবে যেন যোগ্য ব্যক্তি এটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

ক) খলীফা বলতে কী বুঝায় ? ১
খ) "খোলাফায়ে রাশেদীনে" মোট কতজন খলীফা ছিলেন? ২
গ) উদ্দীপকের যুবসংঘ ও খিলাফতের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩
ঘ) খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে খলীফা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন? ৪

পাঠ-৬.২ হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আবু বকর (রা.) এর বংশ পরিচয় ও প্রাথমিস জীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও ইসলামের প্রতি তার ভালবাসা ও অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত লাভ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইসলামের ত্রাণকর্তা, সিদ্দীক (বিশ্বাসী), আনসার ও মুহাজির**

বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (স.) এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম রক্ষায় নিজ সমুদয় সম্পদ যেমন দান করেছিলেন তেমনি খিলাফতে আসীন হয়ে অন্যায়ের সাথে কোন প্রকার আপোষ করেননি। একারণেই তাকে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

হযরত আবু বকর (রা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাল্যনাম ছিল আবদুল্লাহ; ডাক নাম ছিল আবু বকর (কুনিয়া)। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি 'সিদ্দীক (বিশ্বাসী)' খেতাব লাভ করেন। আবু বকর (রা.) এর পিতার নাম ছিলো আবু কোহাফা এবং মাতার নাম ছিল উম্মুল খায়ের সালমা। যৌবনে আবু বকর তাঁর নৈতিক আদর্শের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন। আবু বকর (রা.) পেশায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের সেবা

বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন। তখন আবু বকর (রা.) বিনা দ্বিধায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তার প্রচেষ্টায় অনেকেই ইসলাম কবুল করেন এবং হযরত বিলাল (রা.) সহ অনেক দাসকে তিনি শৃঙ্খলামুক্ত করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন- ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর "ইসলামের সেবায় আবু বকরকে কেউ অতিক্রম করেতে পারেনি।"

মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ভক্তি

৬২২ খ্রিস্টাব্দের হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.) এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক ও হুনাইনের যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.) এর অসুস্থতার সময় তাঁর স্থলে ইমামতি করেন। এতে বুঝা যায় যে, নবীজী (সা.) আবু বকর (রা.)কেই তাঁর অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত বলে মনে করতেন।

সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব

মহানবী (সা.) এর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি তাঁর ওফাতের সময় উত্তরাধিকারীও মনোনীত করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন? এই প্রশ্ন নিয়ে মুসলিম জাহানে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিল [P.K Hitti বলেন- æThe caliphate is therefore the first problem Islam had to face."
এই প্রশ্নে মুসলিমগণ আনসার ও মুহাজীর এই দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মদীনার সংকটময় পরিস্থিতির আনসারগণ সাদ বিন ওবায়দাকে এবং একদল মুহাজীর হযরত আলী (রা.) কে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করেন।

খিলাফত লাভ

ইসলামের সংকটময় সময়ে হযরত উমর (রা.) এবং আবু উবায়দাকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) সহ ছাকিফা বানী সায়িদা গৃহে অবস্থান করছিলেন। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে হযরত উমর (রা.) বয়স, অবস্থান, পদমর্যাদা,

সম্মান ইত্যাদি বিবেচনা করে হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের প্রথম খলীফা বলে ঘোষণা করে তাঁর হাত স্পর্শ করে বায়াৎ গ্রহণ করেন। সাদ ব্যতীত সমস্ত মহল হতে মুসলিম জনতা তাঁকে খলীফা বলে অভিবাদন জানাল।

খলীফার উদ্বোধনী ভাষণ

খলীফা নির্বাচিত হবার পর হযরত আবু বকর (রা.) সকলের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এই ভাষণে গণতান্ত্রিক চেতনা ফুটে উঠেছে যা ছিল আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল বক্তব্য। এতে খলীফার স্বৈরাচারী মনোভাবের নিষিদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থার স্বরুপ প্রকাশ পেয়েছে। আর সকল কিছুর উর্ধ্বে ইসলামী শরীয়তের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.) এর খলীফা নির্বাচনে মুসলিম বিশ্বের প্রথম ভয়াবহ সংকট দূরীভূত হয়। তাঁর নির্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হয়। এর পর থেকে মুসলিম বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সূত্রপাত হয়। তাঁর খিলাফত প্রাপ্তি যুক্তিসঙ্গতও ছিল। ইসলামের জন্য তিনি যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং দূরদর্শিতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ধর্মপরায়ণতা এবং অন্যান্য গুণে তিনি নিঃসন্দেহে অধিক উপযুক্ত ছিলেন। খলীফা হওয়ার পর আবু বকর (রা.) সমবেত মুসলিমদেরেকে উদ্দেশ্যে করে ভাষণ প্রদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে তিনি খলীফা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জনগণকে অবহিত করেন। একজন খলীফাকে যে স্বেচ্ছাচারী নীতির পরিপন্থী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করতে হয় তা তিনি অকপটে প্রকাশ করেন এবং তিনি যে ইসলামী শাসন প্রবর্তনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করেন।

সারসংক্ষেপঃ

দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা, ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি দিক দিয়ে যোগ্যতম হওয়ায় আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। খলীফা হিসাবে তিনি তার দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আবু বকর (রা.) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) আওস গোত্রে খ) খাজরাজ গোত্রে
গ) নাদির গোত্রে ঘ) তায়িম গোত্রে

২. মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল কেন?
ক) দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে খ) বিদেশীদের আক্রমণে
গ) খলীফা নির্বাচন নিয়ে ঘ) বিভিন্ন গোত্রে যুদ্ধ হয়েছিল বলে

৩. আবু বকর (রা.) এর খলীফা নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারণ-
i) তিনি ছিলেন বয়োঃজ্যেষ্ঠ ii) ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ iii) তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল
নিচের কোন্‌টিসঠিক-
ক) i, iii খ) i, ii, iii গ) i, ii ঙ) i, ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রসুলপুর গ্রামে, গ্রামপ্রধান নির্বাচনে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হলো। এতে গ্রামবাসী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেউ অর্থের জোরে, কেউ গায়ের জোরে গ্রামপ্রধান হওয়ার দাবী জানাল। কিন্তু পরবর্তীতে গ্রামের বিজ্ঞ, দানশীল, অভিজ্ঞ, পরোপকারী রহিম মিয়া গ্রামপ্রধান নির্বাচিত হওয়ায় সকল গ্রামবাসী তার আনুগত্য মেনে নেয়।

ক) ইসলামের প্রথম খলীফা কে ছিলেন ? ১
খ) ইসলামের সেবায় আবু বকর (রা.) এর অবদান সংক্ষেপে লিখুন। ২
গ) উপরের ঘটনার সাথে আবু বকর (রা.) এর জীবনের কোন ঘটনা মিলে যায়- ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) "আবু বকর (রা.) এর খলীফা নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত ছিলো" আপনি কি তা মনে করেন। ৪

পাঠ-৬.৩ রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রিদ্দা যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রিদ্দা যুদ্ধের কারণ ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**স্বধর্মত্যাগী, নবুয়্যতের মোহ, ভণ্ডনবীর, বনু ইয়ারুব গোত্র ও রিদ্দার যুদ্ধ**

হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে সংগঠিত রিদ্দার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক বিপদস্বরুপ এই যুদ্ধে আবু বকর (রা.) কঠোরহস্তে বিদ্রোহীদের দমন করেন।

রিদ্দা যুদ্ধ

'রিদ্দা' আরবী শব্দ। এর অর্থ প্রত্যাবর্তনকরণ বা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া। মহানবী (স.) এর মৃত্যুর পর এক শ্রেণির মুসলিম ইসলাম ধর্মকে বর্জন করে, তাদের পৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্তন করে। ইসলাম প্রচারের পর মক্কা ও মদীনা কেন্দ্রীক ইসলাম ধর্ম সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। এই সময় মহানবীর মৃত্যুর পরে কতিপয় ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটল, কেউ কেউ পৌত্তলিকতায় ফিরে গেল। সমগ্র আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল। ইসলামের প্রথম খলীফা এই সকল স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, যা ইতিহাসে 'রিদ্দার যুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসকি P.K Hitti বলেন- æ The short caliphate of abu- Bakr (632-4) was mostly occupied with the so-called *riddah* (secession, apostasy) wars."

রিদ্দা যুদ্ধের কারণ

ক) ইসলাম প্রচারের স্বল্পতা ঃ

মহানবী (স.) এর জীবদ্দশায় কেবলমাত্র বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতিরাই ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে গোত্রপতিদের অনুসরণে গোত্রের অন্যান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করত। এর ফলে সকলের নিকট ইসলামের আদর্শের বাণী ও সৌন্দর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা হতো না। তাই তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগে তৎপর হয়ে উঠে।

খ) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ঃ

ইসলামের অনুশাসন অনুসারে আর্থিকভাবে অবস্থাসম্পন্নদের জন্য যাকাত প্রদান করা আবশ্যক কিন্তু তৎকালীন আরব উপদ্বীপের অভিজাত শ্রেণির জন্য যাকাত প্রদান করা ছিল তাদের আভিজাত্যের জন্য হুমকিস্বরুপ। তাই তারা ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর হয়ে উঠে।

গ) মদীনা রাষ্ট্রের প্রাধান্য অস্বীকার ঃ

পূর্বে আরব গোত্রগুলি ছিলো পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। তাই যখন মদীনা রাষ্ট্রের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এই বিচ্ছিন্ন গোত্র গুলো এই প্রাধান্যকে তাদের জন্য হুমকিস্বরুপ মনে করলো। তারা ইসলামের ভ্রতৃত্ববোধ কে অস্বীকার করলো। ইসলাম ধর্ম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠল।

ঘ) নবুয়্যতের প্রতি মোহ ঃ

স্বার্থান্বেষী কিছু আরব নবুয়্যতকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেছিল। তারা এর মহান উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাই অনেক ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটলো। অনেক গোত্রপতি নবুয়্যতের দাবী করলো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন (তোলায়হা, সাজাহ, মুসায়লামা ও আসওয়াদ আল- আনসি)

ঘটনাপ্রবাহ

খলীফা আবু বকর (রা.) স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হতে সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। সমগ্র সেনা বাহিনীকে তিনি **১১** টি ভাগে বিভক্ত করে এক এক ভাগকে এক এক অংশে প্রেরণ করলেন। তিনি মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করলেন। মুসলিম সেনাপতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- খলিদ বিন ওয়ালিদ, ইকরাম, শুরাহবিল, মুহাজির বিন আবি উমাইয়া উল্লেখযোগ্য। হযরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মদীনা ছিলো সেনাবাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। এই সকল যোগ্য সেনাপতির নেতৃত্বে একে একে সকল ভণ্ডনবীকে পরাজিত করা হলো। বিদ্রোহী গোত্রগুলো একের পর এক পরাজিত হল এবং খলীফার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

ফলাফল

ক) এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইসলামের বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
খ) বিভিন্ন গোত্র যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হয়।
গ) ইসলাম সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হয়।
ঘ) মদীনা রাষ্ট্রের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভণ্ডনবীগণ ও তাদের পতন

হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে একটি উল্লেযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কতিপয় ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব। যারা ছিলো রিদ্দা যুদ্ধের অন্যতম অনুঘটক। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পরে কতিপয় আরবগোত্র প্রধান নিজেদের মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবি জানায়। তারা নবুয়্যাতের মহান তাৎপর্যকে অসম্মান জানায় এবং এটিকে একটি সম্মানজনক পদ বলে বিবেচনা করে।

এদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন-

আসওয়াদ আল আনসি ঃ

সে ছিলো ইয়েমেনের বাসিন্দা। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায়ই (৬৩১-৩২) সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করেন। সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও ইয়েমেনের মুসলিম শাসনকর্তাকে পদচ্যুত ও বিতাড়িত করে। সে অন্যান্য আরব গোত্রের সহোযোগিতায় বিদ্রোহ করে, কিন্তু সে তার নিজ আত্মীয় ফিরোয দায়লামী কর্তৃক নিহত হয়। এই ঘটনা ঘটে মহানবী (স.) এর ওফাতের কিছুদিন পূর্বে।

তুলায়হা ঃ

সে ছিলো নজদের অধিবাসী । আবু বকর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বুজাকার যুদ্ধে তুলায়হা খালিদ কর্তৃক পরাজিত হয়। সে ছিলো বনী আসাদ গোত্রের লোক। তার পরাজয়ের পরে বনু আসাদ গোত্রকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় এবং গোত্রটি ইসলাম কবুল করে নেয়।

সাজাহ ঃ

বনু আসাদ গোত্রে অভিযানের পর খালিদ (রা.) বনু তামিম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এই ধর্মত্যাগী গোত্রটির প্রধান ছিলো ভণ্ড নবুয়্যাতের দাবীদার একজন নারী, সাজাহ। সে বনু তামিমের উপগোত্র বনু ইয়ারুব গোত্রের অধিবাসী ছিলো। বনু ইয়ারুব গোত্র তাকে নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালে সাজাহ অপর ভণ্ডনবী মুসায়লামার সাথে মিলিত হয় এবং তাকে বিবাহ করে।

মালিক বিন নুবায়রা ঃ

বনু ইয়ারবু গোত্রের নেতা ছিলো মালিক বিন নুবায়রা। নুবায়রা আনুগত্য অস্বীকার করলে, খালিদ তাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধে সে নিহত হয়।

মুসায়লামা ঃ

ভণ্ড নবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলো মুসায়লামা। প্রথমে ইকরামা ও শুরাহবিল (রা.)-কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কিন্ত তাঁরা ব্যর্থ হলে, ৬৩৩ খ্রিঃ খালিদ (রা.) তাকে ইয়ামামার যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধটি একটি প্রাচীরঘেরা

বাগানে সংঘটিত হয়েছিলো ও এতে অসংখ্য লোক মারা যায়। তাই ঐতিহাসিকেরা একে 'Battle of the Gardens of Death' বা মৃত্যু উদ্যান যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সারসংক্ষেপঃ

রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগী যুদ্ধ ছিল ইসলাম ও মদীনা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরুপ। অবশেষে খলীফা আবু বকরের নেতৃত্বে মুসলিমগণ স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. "রিদ্দা যুদ্ধ" কোন খলীফার সময়ে হয়?

ক) হযরত আলী (রা.) খ) হযরত উমর (রা.)

গ) হযরত উসমান (রা.) ঘ) হযরত আবু বকর (রা.)

২. আবু বকর (রা.) ভণ্ড নবীদের দমন করেছিলেন। কারণ তারা -

ক) শক্তিশালী ছিল খ) খলীফা পদের দাবী করেছিল

গ) নবুয়্যতের দাবী করেছিল ঘ) অমুসলিম ছিল

৩. আবু বকর (রা.) স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কারণ তারা-

i) যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে ii) ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধকে অস্বীকার করে

iii) নবুয়্যতের দাবী করে

নিচের কোন্‌টিসঠিক

ক) i, iii খ) i, ii

গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হোসেন আলী কলেজের ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক আবুল কাসেম হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রিদ্দা যুদ্ধের আলোচনা করলেন, যা তার সময়ে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবু বকর (রা.) কঠোর হস্তে স্বধর্মত্যাগীদের দমন করেন।

ক) রিদ্দা শব্দের অর্থ কী? ১

খ) কয়েকজন ভণ্ডনবীর নাম লিখুন। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত "রিদ্দা" যুদ্ধের ফলাফল কী কী ছিল- তুলে ধরুন। ৩

ঘ) "রিদ্ধা" যুদ্ধের পিছনে কি কি কারণ ছিল বলে আপনার মতামত লিখুন। ৪

পাঠ-৬.৪ হযরত আবু বকর (রা.) এর বিজয় অভিযানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফত কালে পারস্য ও সিরিয়া অভিযান সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- এই সব অভিযানে সংঘটিত যুদ্ধ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মুসান্না, খালিদ বিন ওয়ালিদ, হাফির যুদ্ধ ও The Lady Castle.**

আবু বকরের খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে। তাঁর সময়কালে পারস্য ও সিরিয়ায় মুসলিমদের বিজয় নিশান উড্ডীন হয়।

পারস্য অভিযান ঃ

রিদ্দা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পারস্যের অধিবাসীগণ স্বধর্মত্যাগীদের সাহায্য করেছিল। তাই পারস্যবাসীর এরুপ মনোভাব ভবিষ্যতে এ মদীনা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরুপ বিবেচনা করে হযরত আবু বকর (রা.) পারস্যে মুসলিম অভিযান প্রেরণ করলেন। প্রথম পর্যায়ে (৬৩৩ খ্রি:) মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন মুসান্না, তার অধীনে ছিল প্রায় ৮,০০০ সৈন্য । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সেনাপতি মুসান্না সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হলেন। অত:পর খলীফা শ্রেষ্ঠ মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) কে প্রেরণ করলেন। এই দুই সেনাপতি উবাল্লা নামক স্থানে মিলিত হল, এতে করে মুসলিমবাহিনীর সামর্থ্য বেড়ে গেল। এই মিলিত সেনা বাহিনী পারস্যবাহিনীর সঙ্গে হাফির নামক স্থানে মিলিত হল।

হাফিরের যুদ্ধ ঃ

এই যুদ্ধ 'হাফির' অর্থাৎ শৃংখলের যুদ্ধ বা (Battle of Chain) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পারস্যের সেনাপতির সেনা বাহিনীকে শৃংখলের মত বিন্যস্ত করেছিলেন, তাই এই যুদ্ধকে বলা হয় 'শৃংখলের যুদ্ধ'। যুদ্ধে পারস্যবাসী পরাজিত হয়। পারস্যের সেনাপতি 'হরমুজ' খালিদ (রা.) এর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। The Lady Castle বা হাফির যুদ্ধের পর মুসলিমবাহিনী আরো অগ্রসর হতে থাকেন। ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তীর ঘেষে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের নিকটবর্তী জনৈকা রাজকুমারী দ্বারা পরিচালিত একটি দুর্গ মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এটি ইতিহাসে মহিলা দুর্গ (The Lady's Castle) নামে সর্বাধিক পরিচিত।

হীরা বিজয় ঃ

অপর একটি পারসিক সেনাবাহিনীকে উলিসের যুদ্ধে পরাজিত করে বীর যোদ্ধা খালিদ (রা.) হীরা অধিকার করেন। হীরার অমুসলিম শাসনকর্তা মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করেন, খলীফার নিকট আনুগত্য জানান। এই সময় হীরার খ্রিস্টান অধিবাসীদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হয়। খলীফা তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আনবার অধিকার ঃ

হীরা বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী আরো সামনে অগ্রসর হয়ে ফোরাত নদীর তীর ঘেঁষা আনবার দখল করেন। সেনাপতি খালিদ (রা.) এরপর আইনুত্-তামার ও দুমায় মুসলিম বিজয় সম্পন্ন করেন।

সিরিয়া অভিযান ঃ

সিরিয়া তখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এর শাসক ছিলেন হিরাক্লিয়াস। রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায়, হিরাক্লিয়াস রাসূলের প্রেরিত দূতকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলের মৃত্যুর পর কালক্রমে তার এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। হিরাক্লিয়াস রিদ্দা যুদ্ধে বিদ্রোহীদের উস্কানিদাতা ছিলেন এবং সিরিয়া ও আরব সীমান্তবর্তী বেদুইন গোত্রের সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাই খলীফা এই গুমকির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন।

এছাড়াও শুরাহবিল কর্তৃক মহানবীর দূতকে মূতা নামক স্থানে হত্যা করা হলে, মুসলিমদের এই প্রতিশোধ নেওয়া আবশ্যক হয়ে দাড়ায়। কারণ এটি ছিল আন্তর্জাতিক চুক্তির অপমান।

আজনাদাইনের যুদ্ধ ঃ

প্রথমে আবু বকর(রা:) উসামার নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনী সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। পরে ৬৩৪ খ্রিঃ সিরিয়ার আজানদাইন নামক স্থানে মুসলিম সেনাবাহিনী সিরিয়া বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয়। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনী জয়ী হয়। হিরাক্লিয়াস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে এন্টিয়কে আশ্রয় নেয়। মুসলিমরা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক দখল করে নেয়। এই সময় মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আমর-ইবনে আল আস, সুরাহবিল-ইবনে-হাসানাহ, ইয়াজিদ-ইবনে-আবী-সুফিয়ান এবং আবু-উবাইদা-ইবনে-জাররাহ। মুসলিম সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬,০০০ অপর পক্ষে হিরাক্লিয়াসের সাথে ছিল প্রায় এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) হীরা জয়ের পর, হীরা ত্যাগ করে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু-বকর (রা.)-যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তাঁর নিকট এই পারস্য বিজয়ের সংবাদ পৌছায়।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত আবু বকর (রা.) স্পল্প মেয়াদের খিলাফতকালে সিরিয়া ও পারস্যে বিজয় ছিল উল্লেখযোগ্য মুসলিম বিজয়। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এ সকল অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম অভিযান কোথায় প্রেরণ করেন?
   ক) সিরিয়ায় খ) ইসরাইলে
   গ) পারস্যে ঘ) মেসোপটেমিয়ার

২. আবু বকর (রা.) এর বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান প্রেরনের মূল কারণ ছিল-
   ক) রিদ্দা যুদ্ধে ঐ সকল অঞ্চল স্বধর্মত্যাগীদের সহায়তা করেছিল।
   খ) রাজ্য প্রতিষ্ঠা গ) অর্থনৈতিক ঘ) ঐ সকল অঞ্চল বর্বরতাপূর্ণ ছিল

৩. আবু বকর (রা.) অভিযান প্রেরণ করেন-
   i) পারস্য ii) স্পেন iii) সিরিয়া
   নিচের কোন্‌টি সঠিক
   ক) i, ii, iii খ) i, ii গ) i, iii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারতবর্ষ অভিযান করেন। তাঁর এই অভিযান ধর্মীয় অপেক্ষা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিলো। তিনি বিজিত অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম প্রচার করেন নি।

ক) হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি কে ছিলেন ? ১
খ) 'হাফির' বা 'শৃংখলের' যুদ্ধ সম্পর্কে লিখুন? ২
গ) হযরত আবু বকর (রা.) এর সিরিয়া অভিযানের কারণ কি ছিল? ৩
ঘ) রাজ্য বিজেতা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.৫ হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনব্যবস্থা ও চরিত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানবেন ও
- হযর আবু বকর (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	উত্তরসূরী, রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী, মজলিশ-ই-শুরা, ভণ্ডনবী ও ইসলামের ত্রাণকর্তা

ইসলামী রাষ্ট্রের এক সংকটময় অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রের হাল ধরেন। তার উপর খিলাফতের মহান দায়িত্ব আরোপিত হয়। তিনি ছিলেন রাসূল (স.) এর যোগ্য উত্তরসূরী। রাসূল (সা.) এর দেখানো পথ অনুসারে তিনি রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক ঃ

তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। তার শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র। তার খিলাফতে নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বায়াত গ্রহণের পর সকলের উদ্দেশ্যে উদ্বোধনী ভাষণটি গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর স্পষ্ট মনোভাবের স্বাক্ষর বহন করে।

পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ

হযরত আবু বকর ছিলেন পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবীদের দ্বারা পরিচালিত 'মজলিশ-ই-শুরা' এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তিনি এর মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তিনি বলতেন, "আমাকে আল্লাহর খলীফা বলিও না, আমি কেবল আল্লাহর রাসূলের খলিফা।"

রাষ্ট্র সংগঠক ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন একজন সত্যিকারের রাষ্ট্র সংগঠক। মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পরের সমগ্র আরব জাতি ইসলামের পথ হতে দূরে সরে যায়, যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব ঘটে। সেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে তিনি শক্ত হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরেছিলেন। রাষ্ট্রকে একটি সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে P.K Hitti বলেন- æ The peninsula was now united under abu-Bakr by the sword of khalid."

ইসলামের ত্রাণকর্তা ঃ

ইসলামে খেদমতের জন্য খুব কম সংখ্যক লোকই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। তন্মধ্যে আবু বকর (রা.) অগ্রগণ্য। ইসলামের প্রতি তাঁর ত্যাগ ও সেবা ছিল অপরিসীম ও অপরিমেয়। তাই তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বা 'Savior of Islam' বলা হয়।

কুরআন সংরক্ষণ ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য কুরআন-এ হাফিযের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআন এর অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। তখন হযরত আবু বকর (রা:) বিশিষ্ট সাহাবীদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। মহানবী (স.) এর প্রধান ওয়াহী লেখক ও সচিব যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-কে প্রধান করে এই সংকলনের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এই কুরআন সংকলন করে তিনি শুধু কুরআনের হেফাযতই নিশ্চিত করেননি, বরং তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রকে ভবিষ্যৎ সংকট হতে রক্ষা করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর চরিত্র ঃ

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর(রা:) ছিলেন অসামান্য চারিত্রিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর চারিত্রিক কোমলতা ও মাধুর্যতা ছিল আকর্ষণীয়। তিনি বিদ্বান ও অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রাসূল (সা.) তাকে সিদ্দীক বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করেন। ইসলামের প্রতি তার অনুরাগ ছিলো অসীম। তিনি নবী করীম (সা.) কে ছায়ার মত

অনুসরণ করতেন। মহানবী (সা.) এর সকল আদর্শের প্রতিফলন তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিলো। যদিও তিনি ব্যক্তি জীবনে সরল ও কোমল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তথাপি ন্যায় বিচার ও ইসলামের আদর্শের ক্ষেত্রে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রিদ্দা যুদ্ধে ভণ্ডনবীদেরকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। আরব গোত্রগুলো যখন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তিনি যাকাত আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ় মনের অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ইসলামের ত্রাণকর্তা।
তিনি ছিলেন সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। তিনি বায়তুল মাল হতে যৎসামান্য ভাতা গ্রহণ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে বায়তুল মালে গচ্ছিত করেন।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.) এর যোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি ইসলামের সংকটজনক অবস্থায় অসামান্য অবদান রাখতে সমর্থ হন। শাসনব্যবস্থায় তিনি ছিলেন সুদক্ষ ও কঠোর এবং চারিত্রিক দিক থেকে তিনি ছিলেন কোমল ও অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রধান ওয়াহী লেখক কে ছিলেন?

ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)
গ) হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রা.) ঘ) হযরত উমর (রা.)

২. হযরত আবু বকর (রা.) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন?

ক) ইসলামের সংকটজনক মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য খ) মহানবী (সা.) তাঁকে এই উপাধি দেন
গ) মদীনাবাসীকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন ঘ) আবু বকর (রা.) এর অন্তিম ইচ্ছা ছিল

৩. আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলন করেন-

i) ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিয নিহত হন ii) কুরআন অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়
iii)মহানবী (সা.) বলেছিলেন
নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, iii খ) i, ii, iii গ) ii, iii ঘ) i, ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

হোসেন মিয়া রুপপুর গ্রামের কল্যাণে নিয়োজিত একজন একনিষ্ঠ প্রতিনিধি। জনগণের সুখ দুঃখ, দুর্দশা, দুঃসময়ে সর্বদা এগিয়ে আসে মানুষটি। বিপদে বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত। রুপপুর গ্রামের সংকটজনক অবস্থায় তিনি এর হাল ধরেন। তার নিরলস প্রচেষ্টায় পিছিয়ে-পড়া, কুসংস্কারছন্ন, সংঘাতপূর্ণ গ্রামটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করে।

ক) বয়স্কদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে? ১
খ) আবু বকর (রা.) কে সিদ্দিক উপাধি দেয়া হয় কেন ? ২
গ) "উদ্দীপকের হোসেন মিয়া যেমন গ্রামের সংকটজনক অবস্থার উত্তরণে তেমনি আবু বকর (রা.) মুসলিম জাহানের সংগঠক হিসেবে কাজ করেন।" ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) হযরত আবু বকর (রা.) কে কেন ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-৬.৬ হযরত উমরের (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উমর (রা.) এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানবেন ও
- কীভাবে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন সে সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	আদ্দিয়া বা আদিয়া গোত্র, আল ফারুক, ওয়াহী লেখক ও মক্কা বিজয়

হযরত উমর (রা.) ৫৮৩ খ্রিঃ কুরাইশ বংশের 'আদ্দিয়া' বা আদিয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু হাফস। তাঁর পিতার নাম ছিল খাত্তাব ও মাতা হানতামা। হযরত উমর ছিলেন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী ব্যক্তি। তিনি কুস্তিতে পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন কুরাইশ বংশে যে ১৭ জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন তার মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ব্যবসা ছিলো তার প্রধান পেশা। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন ইসলামের ঘোর বিরোধী । একদিন আবু সুফিয়ানের কুমন্ত্রণায় হাতে উদ্ধত তরবারী নিয়ে মহানবী (স.) কে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে তিনি তার ভগ্নি ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সায়িদ এর গৃহ হতে কুরআনের বাণী শুনে বিমোহিত হন। তার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষনাৎ রাসূল (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। মহানবী (সা.) তাকে 'আল ফারুক' বা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধি দেন। এটি ছিলো ইসলামের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

ইসলামের প্রতি খেদমত ঃ

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রা.) ইসলামের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি সবকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। তাবুক অভিযানের সময় তিনি তাঁর মোট সম্পত্তির অর্ধেক যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি হিজরতের পরে মহানবী (সা.) কে মসজিদে আযান প্রচলনের পরামর্শ দেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর খলীফা আবু বকরের হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন।

খিলাফত প্রাপ্তি ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) যখন গুরুতর অসুস্থ তখন তিনি মুসলিম বিশ্বের জন্য একজন খলীফাকে মনোনয়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সকল গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে তিনি হযরত উমর (রা.) কে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। এজন্য তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি হযরত উসমান (রা.), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), আনসার ও মুহাজিরদের কাছে তার মনোভাব প্রকাশ করলেন। সকলেই তার অভিমতকে গ্রহণ করলো। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) তাঁর কঠোরতার প্রতি খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। খলীফা তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, তার উপর দায়িত্ব বর্তালে তিনি কোমল হয়ে যাবেন। তারপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.) এর দ্বারা একটি মনোনয়পত্র তৈরি করালেন। উপস্থিত জনতা তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল ও গ্রহণ করলেন।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উমর (রা.) এর জীবন ছিল ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর খিলাফত লাভ মুসলিম বিশ্বের জন্য ছিল আশির্বাদ স্বরুপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হযরত উমর (রা.) কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ৫৭০ সালে
খ) ৪৮৩ সালে
গ) ৫৮০ সালে
ঘ) ৮৩ সালে

২. হযরত উমর (রা.) কঠোর হওয়া সত্ত্বেও তাকে খলীফা নির্বাচনের পেছনে যুক্তি কী ছিল ?

ক) মহানবী (সা.) এর মনোনয়ন অনুযায়ী
খ) খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি কোমল হয়ে যাবেন বলে
গ) জনগণ তাকে ভয় পেত বলে
ঘ) হযরত উমর (রা.) এর ইচ্ছা অনুযায়ী

৩. ইসলামের সেবায় উমর (রা.) এর অবদান হল-

i) নামাযের পূর্বে আযানের ব্যবস্থা করায়
ii) প্রকাশ্যে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করায়
iii) তাবুক যুদ্ধে অর্ধেক সম্পত্তি দান করায়

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i, iii
খ) i, ii
গ) ii, iii
ঘ) i, ii, iii

৪. একজন খলীফা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি উদ্ধত তরবারি নিয়ে মহানবী (সা.) কে হত্যা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। উদ্দীপকে কোন খলীফার কথা বলা হয়েছে?

ক) হযরত আবু বকর (রা.)
খ) হযরত উমর (রা.)
গ) হযরত ওসমান (রা.)
ঘ) হযরত আলী (রা.)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

তাশকিয়া শ্রেণিকক্ষে তার শিক্ষকের কাছ থেকে একজন সাহাবির কথা শুনলো, যিনি আল-ফারুক উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজের জন্য আযানের ব্যবস্থা করেন এবং প্রকাশ্যে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

ক) ইসলামের ২য় খলীফা কে ছিলেন ? ১
খ) হযরত উমর (রা.) কে আল ফারুক বলা হয় কেন ? ২
গ) উদ্দীপকে যে সাহাবির কথা বলা হয়েছে ইসলামের খেদমতে তাঁর অবদান লিখুন। ৩
ঘ) উমর (রা.) এর খিলাফত লাভের ঘটনা বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৬.৭ হযরত উমর (রা.) বিজয় অভিযানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উমরের শাসনামলে মুসলিমদের বিজয় অভিযান সম্পর্কে জানবেন;
- বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমদের অভিযান সম্পর্কে জানবেন ও
- রোমানবাহিনীর সাথে মুসলিমদের সংঘঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে জানবেন ।

	মুখ্য শব্দ	**জসরের যুদ্ধ, বুয়ায়েবের যুদ্ধ, নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ, ইয়ামুল আরমাছ ও ইয়ামুল উম্মদ**

খিলাফত লাভের পর হযরত উমর (রা.), হযরত আবু বকর (রা.) এর ন্যায় সীমান্ত সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধন করলেন। তিনি ইসলামের পতাকা, দুটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যের মাটিতে স্থাপন করলেন।

পারস্য বিজয় ঃ

পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল বর্তমান ইরাক, ইরান, মেসোপটোসিয়া থেকে অক্সাস নদী (আমুদরিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময় বিভিন্ন ঘটনা ও কারণ মুসলিমদেরকে পারস্য বিজয় করতে উদ্বুদ্ধ করে।

পারস্য বিজয়ের কারণসমূহ ঃ

পারস্য সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বে এক উন্নত ও আধুনিক সভ্যতা। তারা সর্বাত্মক ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই সময় পারস্য ছিল ২য় খসরুর শাসন অধীনে।

ক) মুসলিম দূতকে হত্যা ঃ মহানবী (সা.) প্রেরিত দূত খুসরু পারভেজের দরবারে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলেন, পারস্যরাজ তাকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ছিল নীতিবিরুদ্ধ।

খ) ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ইরাক ও ক্যালদীয় অঞ্চল ছিলো ভৌগোলিকভাবে আরবের সীমান্তবর্তী। এই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজন তাদের আরবীয় গোত্রের আত্মীয় স্বজনকে সর্বদাই ইসলামের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা প্রদান করতো। এটা ছিলো মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাই সীমান্তে নিরাপত্তা বিধান আবশ্যক ছিলো।

গ) অর্থনৈতিক কারণ ঃ পারস্য ছিল ট্রাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাত) নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এর মেসোপটেমিয়া অঞ্চল ছিল পৃথিবীর অন্যতম উর্বর উপত্যকা। যা ছিল কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য সহায়ক। কিন্তু পারস্যবাসী আরবদের ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করে।

পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি ঃ

ক) ব্যবিলনের যুদ্ধ ঃ ৬৩৪ খ্রিঃ এই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে খালিদ (রা.) কর্তৃক উলিসের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে হীরা দখলকৃত হয়। এই সময় পারস্য রাজ খসরু হরমুজের নেতৃত্বে ১০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী মুসান্নার বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। মুসান্না ফোরাত নদী পার হয়ে শত্রুর বিপক্ষে ঝাপিয়ে পড়ে। শত্রুরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ 'ব্যবিলনের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

খ) নামারিকের যুদ্ধ ঃ হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত কালে মুসান্না ও খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) হীরা দখল করেন। এটি ছিল তৎকালীন সাসানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে হীরা ছিল পারস্যবাসীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই পারস্যবাসীরা হীরা মুসলিমদের হাত থেকে উদ্ধারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। পারস্য সম্রাট এই দায়িত্ব অর্পন করেন পারস্যের কিংবদন্তী সেনাপতি রুস্তমের হাতে। মুসান্না তখন পারস্যের সীমান্তে অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি খলীফার নিকট সাহায্য কামনা করেন। ইতিমধ্যে খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং হযরত উমর (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সাকীফ গোত্রের প্রধান আবু

উবায়দাকে সেনাপতি করে অতিরিক্ত সৈন্য হীরা পুনঃদখলে প্রেরণ করলেন। ৬৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নামারিক নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ সংগঠিত হলো। যুদ্ধে পারস্যবাসী পরাজিত হলো এবং হীরা পুনরায় মুসলিমদের অধীনে চলে এলো।

গ) জসরের যুদ্ধ ঃ নামারকের যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি পারস্যবাসী বেশিদিন ভেঅগ করতে পারছিলো না। অপর দিকে পারসি সেনাপতি বাহমানের নেতৃত্বে ফোরাত নদীর অপর তীরে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হলো। সেনাপতি আবু উবায়দা অভিজ্ঞ সেনাপতি মুসান্নার আদেশ অমান্য করে নৌকা দ্বারা সেতু নির্মাণ করে নদীর অপর তীরে শত্রুর মুখোমুখি হলেন। তাই এই যুদ্ধ জসর বা সেতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত। কিন্তু যুদ্ধে পারস্য সেনা বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে মুসলিম বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়লো। সেতুকে ধ্বংস করা হলো যাতে মুসলিম বাহিনী পশ্চাদপদ হতে না পারে। আবু উবায়দা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হলেন। এবার মুসান্না সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে সেতু মেরামত করে মুসলিম বাহিনীর নিরাপদে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করলেন। যুদ্ধে মুসলিমদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ৯০০০ সৈন্যের মধ্যে ৬০০০ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেন। যুদ্ধটি (ত্রয়োদশ হিজরী রমযান মাস) ৬৩৪ খ্রিঃ এর অক্টোবর মাসে সংঘটিত হয়।

ঘ) বুয়ায়েবের যুদ্ধ ঃ জসরের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয় ও প্রাণহানি খলীফা হযরত উমর (রা.) কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করলো। তিনি এর প্রতিকারের জন্য একদল সৈন্য পাঠান। কুফার কিছু দূরে বুয়ায়েবের নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে পারস্য বাহিনী পরাজিত হল। তাদের সেনাপতি 'মাহরা' যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলো।

ঙ) কাদিসিয়ার যুদ্ধ ঃ পারসিকগণ ছিলো আত্মাভিমানী জাতি । তারা পরাজয়কে মেনে নিলো না। তারা আবারো সমর প্রস্তুতি শুরু করে দিল। মুসান্না ততোদিনে ইন্তেকাল করেছেন। হযরত উমর (রা.) আরেক বিখ্যাত সেনাপতি সাদ-বিন-আবি ওয়াক্কাস (রা.) কে সেনাপতি মনোনীত করলেন। পারসিক রাজা ইয়াজদিজার্দ সেনাপতি রুস্তমকে প্রেরণ করলেন। প্রথমে পারসিক সেনাপতির নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়, রুস্তম অস্বীকৃত হলে উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ৬৩৫ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে কাদেসিয়ার প্রান্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ ৩ দিন স্থায়ী হয়েছিল। এই ৩ দিন আরবদের নিকট "ইয়াওমুল আরমাছ" (বিশৃংখলার দিন), ইয়াওমুল আগওয়াছ (সাহায্যের দিন) এবং ইয়াওমুল উম্মদ (দুর্দশার দিন) নামে পরিচিত। রুস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলো। এতে পারস্য বাহিনী বিশৃংখল হয়ে পলায়ন শুরু করে। কাদিসিয়ার যুদ্ধ ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধ। এতে পারস্যের অহংকার ও শক্তি বহুলাংশে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

চ) মাদায়েন অধিকার ঃ মাদায়েন অর্থ দুই-শহর। এর পশ্চিম ভাগের নাম অলুকিয়া ও পূর্বভাগের নাম টেসিফোন। কাদিসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর সেনাপতি সাদ (রা.) খলীফার অনুমতি নিয়ে পারস্যের রাজধানী মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করলেন। মার্চ, ৬৩৭ খ্রি: সাদ (রা.) মাদায়েন অধিকার করলেন এবং এখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

ছ) জালুলার যুদ্ধ ঃ পারস্যরাজ মাদায়েন হতে প্রায় ১০০ মাইল দূরবর্তী হলওয়ালে আত্মগোপন করেন। সেনাপতি সাদ অপর সেনাপতি কাকার নেতৃত্বে এক সেনা বাহিনী প্রেরণ করলেন। আট দিন অবরুদ্ধ থাকার পর জালুলা দুর্গের পতন ঘটলো। এখানে একটি শক্তিশালী মুসলিম সেনা নিবাস স্থাপন করা হল। যুদ্ধের সময় ছিল ৬৩৭ খ্রি: ।

জ) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ ঃ পারস্য চূড়ান্তভাবে বিজিত হয় নিহাওয়ান্দের যুদ্ধের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পারস্য সেনাপতি হরমুজান মুসলিমদের হাতে বন্দী হন এবং মদীনায় গিয়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। অপরদিকে পারস্যবাহিনীর ক্রমাগত উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে খলীফা তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে আহবান জানায়। দক্ষিণ পারস্যে মুসলিমরা অগ্রসর হলে ইয়াজদিজার্দ ১,৫০,০০০ সৈন্য সমাবেশ ঘটালেন। এর নেতৃত্বে ছিল ফিরুযান। মুসলিম সেনাপতি ছিল নুমান বিন মুকরান। উভয় পক্ষ হামাদানের নিকটবর্তী নিহাওয়ান্দে এসে যুদ্ধে লিপ্ত হল। ৬৪২ খ্রি: সংগঠিত এই যুদ্ধ নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে পারস্যবাসী চূড়ান্তভাবে মুসলিমদের নিকট পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী ফার্স, কির্মান্, মাক্রান্, সিজিস্তান্, খোরাসান্ ও আজার্বাইজান অধিকারে সক্ষম হয়। এটি ছিল একটি ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাস্য সাম্রাজ্যের উপর সর্বশেষ আঘাতটি আসে। তাই ইতিহাসে এই যুদ্ধের তাৎপর্য অত্যাধিক।

পারস্য বিজয়ের ফলাফল ঃ

পারস্য বিজয় আরবের মুসলিমদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এই বিজয়ের ফলাফল ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই বিবেচ্য ছিল।

ক) ইতিবাচক ফলাফল ঃ

ইসলামের বিজয় ঃ পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে পারস্যের প্রাচীন 'জরস্থুস্ত্রবাদ' ধর্মের অবসান ঘটে এবং পারস্যে ইসলামের বাণী প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঃ মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে প্রাচীন শক্তিশালী সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আরব খিলাফতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক সুবিধা ঃ পারস্য বিজয়ের মধ্যে দিয়ে মুসলিমগণ মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের উর্বর ভূমি লাভ করে। কৃষি ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণ ঃ পারস্যবাসী ছিল তৎকালীন বিশ্বে প্রাচীন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। তথাকার জীবন প্রণালী ছিল আধুনিক এবং রুচিশীল। তাদের নিকট থেকে আরবগণ শিক্ষা, সামরিক কৌশল, আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে।

খ) নেতিবাচক প্রভাব ঃ

বিলাসিতার অনুপ্রবেশ ঃ পারস্যবাসীর ও পারস্য সভ্যতার সংস্পর্শে সরল ও অনাড়ম্বর আরবদের জীবনে বিলাসিতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তাদের কষ্ট-সহিষ্ণু ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনে ব্যাপক নেতিবাচক ছায়া পড়ে।

আরব-পারস্য রক্তের সংমিশ্রণ ঃ পারস্য বিজয় ও এই অঞ্চলে বসবাসের মাধ্যমে আরবগণ তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা হারায়। যা ছিল বহুলাংশে আরবীয় গুণাবলি বর্জিত। পরবর্তী ইতিহাসে এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শিয়া মতবাদের বিস্তার ঃ

পরবর্তীতে পারস্য হতে শিয়া মতবাদের বিস্তার ঘটে। যা মুসলিম জাতিকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করে দেয়।

গ) মুসলিমদের রোমান সাম্রাজ্য বিজয় ঃ

রোমান সম্রাজ্য ছিল আরবের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর নিয়ে রোমান বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। প্রাথমিসভাবে মহানবী (সা.) এর সময়ে রোমান-মুসলিম সুসম্পর্ক বজায় ছিল, পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে এই সম্পর্ক নষ্ট হয়।

বাইজানটাইন বিজয়ের কারণসমূহ ঃ

ভৌগলিক কারণ ঃ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ছিল আরবের নিকটবর্তী। তাই সীমান্তে নিরাপত্তার জন্য এই বিজয় আবশ্যক ছিল।

মুসলিম দূত হত্যা ঃ মুতার খ্রিস্টান শাসক শুরাহবিল মহানবী (সা.) প্রেরিত দূতকে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে হত্যা করে। তাই মূতার যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

সীমান্তে গোলযোগ ঃ উদীয়মান মুসলিম শক্তির বিকাশ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের জন্য ছিল ভীতিকর। তাই প্রায়ই তারা সীমান্তে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। সীমান্তে বসবাসকারী বেদুইনদেরকে মদীনা আক্রমণে প্ররোচিত করতো। তথাপি মুসলিম বণিকদের নিরাপত্তা ছিল না। তাই বাইজানটাইন আক্রমণ মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে দাড়ায়।

ঘটনা প্রবাহ ঃ ৬৩৪ খ্রিঃ আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলিমদের জয় লাভের সংবাদ আবু বকর (রা.)- এর মৃত্যু শয্যায় মদীনায় এসে পৌছে। পরবর্তী খলীফা হযরত উমর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কে সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

দামেস্ক বিজয় (৬ অক্টোবর ৬৩৫)

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলিম বাহিনীর নিকট পরজিত হয়ে এন্টিয়কে আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি নতুন একটি সেনাবাহিনী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) দামেস্ক অবরোধ করেন। দীর্ঘ ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর দামেস্ক মুসলিমদের অধিকার আসে।

ফিহল এর যুদ্ধ

দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলিমগণ জর্ডানের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় রোমান সেনাবাহিনী জর্ডানে অবস্থান করছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে মুয়ায বিন জাবালের নেতৃত্বে আপস মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত স্থির না হওয়ায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধে আবু উবায়দা (রা.) মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। রোমানরা যুদ্ধে পরাজিত হলো। ইতিহাসে এটিই 'ফিহলের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

হিম্‌স অধিকার (৬৩৫ খ্রিঃ)

হিম্‌স রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন শহর। ফিহল বিজয়ের পর, প্রায় বিনা বাধায় মুসলিমগণ হিম্‌স অধিকার করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ (৬৩৬ খ্রিঃ)

বাইজান্টাইন অধিকার হতে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি শহর দামেস্ক, হাম ও হিমস মুসলিমদের হস্তচ্যুত হয়। সম্রাট হিরাক্লিয়াস বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের এই অফুরন্ত ক্ষতি মেনে নিতে পারেনি। তিনি তার ভ্রাতা থিওডোরাসের নেতৃত্বে ২,৪০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনীর সদস্যরা ছিল মূলত আর্মেনিয়া, সিরিয়া ও রোমান খ্রিস্টানগণ। খ্রিস্টান বাহিনী ইয়ারমুকের প্রান্তে এসে পৌঁছাল। আবু উবায়দা (রা.) ও আমর (রা.) মুসলিম বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছলে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ২৫,০০০ বেশি ছিল না। কিছুদিন পর খালিদ (রা.) ও এসে সেখানে পৌঁছান। ৬৩৬ সালের ২০ আগস্ট এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়। রোমানবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হল। থিওডোরাস যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করলেন। যুদ্ধে রোমান বাহিনীর পরাজয়ের কথা শুনে হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপল এ আশ্রয় গ্রহণ করলেন। যুদ্ধে প্রায় ৭০ হাজার রোমান সৈন্য হতাহত হল এবং ৩০০০ মুসলিম সেনা শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

গুরুত্ব

কাদেসিয়া যুদ্ধের মতো ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল একটি ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাইজানটাইন শক্তির উপর মুসলিমরা চরম আঘাত হানতে সক্ষম হয়। সমগ্র সিরিয়া, তাদের পদানত হয়। পরবর্তীতে কিন্নীসিরিন, এন্টিওক, আলেপ্পো, টায়ার, সিওন প্রভৃতি রোমান অঞ্চল মুসলিমদের অধিকারে আসে।

৫) জেরুজালেম অধিকার (৬৩৭ খ্রিঃ)

জেরুজালেম অধিকার অভিযানে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আমর ইবনে আল-আস (রা.) । তিনি জেরুজালেম অবরোধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে, এর রোমান শাসক আরতাবুন শহর ত্যাগ করে পলায়ন করেন। কিছুদিন অবরুদ্ধ থাকার পর জেরুজালেমের খ্রিস্টান পাদ্রী সাফ্রীউনিয়াস মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার প্রতি ইচ্ছা পোষণ করেন। সেনাপতি আবু উবায়দা (রা.) খলিফাকে এই সংবাদ প্রেরণ করলে খলীফা হযরত উমর (রা.) একজন মাত্র ভৃত্য সহকারে উটের পিঠে চড়ে জেরুজালেমে পৌছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। খলীফা খ্রিস্টানদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেরুজালেমের খ্রিস্টান অধিবাসী জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। খলীফা উমরের হস্তে জেরুজালেম নগরীর চাবি অর্পিত হয়।

৬) জাজিরা বিজয় (৬৩৮ খ্রিঃ)

রোমান সরকারের উস্কানিতে জাজিরাবাসী (যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০) মুসলিম শাসনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেনাপতি আবু ওবায়দা (রা.) তাদেরকে পরাজিত করে জাজিরা দখল করেন। এরপর মুসলিম বাহিনী আর্মেনিয়া ও সাইলেসিয়া দখল করে। পরবর্তী সাত বছরের মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় (৬৩৩-৬৪০) সমগ্র সিরিয়া, প্যালেস্টাইন মুসলিমদের অধিকারে আসে। খলীফা হযরত উমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে ৬৪০ খ্রিঃ সিরিয়ার শাসক হিসেবে নিয়োজিত করেন।

মিসর বিজয় (৬৩৯-৬৪২ খ্রিঃ)

পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ের পর মুসলিমগণ মিসর বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়।

মিসর বিজয়ের কারণ

সামরিক প্রয়োজন ঃ সামরিক দিক থেকে মিসরের অবস্থান ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মিসরে রোমান নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি ছিল।

মুসলিম সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন হতে বিতাড়িত রোমান সৈন্য মিসরে আশ্রয় নেয়। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর ছিল বাইজানটাইন শাসকের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। তাই এটি ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরুপ। তাই অতি সত্বর মিসর বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক চাহিদা ঃ

আরব জাতি সর্বদাই উর্বর ভূমির অন্বেষণে থাকে। নীল নদের তীরে অবস্থিত মিসর ছিল উর্বর, সুজলা, সুফলা অঞ্চল। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা ছিল এই নীলনদের দান। তাই অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করা ছিল এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘটনাসমূহ ঃ

ক) হেলিওপলিসের যুদ্ধ (৬৪০ খ্রিঃ)

মুসলিমরা জেরুজালেম অধিকারের পর আমর ইবন আল-আস (রা.) পরবর্তী অভিযানের জন্য খলীফার অনুমতি কামনা করেন। খলীফার অনুমতি বিলম্বিত হওয়ার কারণে, আমর ব্যক্তিগত উদ্যোগে মিসরের দিকে অগ্রসর হলেন। ৬৩৯ খ্রিঃ আমর 'ওয়াদি আল-আবিশ' নামক স্থান অধিকার করলেন। পথিমধ্যে আল-ফামার বিবলস দখল করেন। এ সময় খলীফা কর্তৃক প্রেরিত যুবাইর-ইবন-আওয়াম ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে মিসরে এসে পৌঁছান। ৬৪০ খ্রিঃ মুসলিম সেনাবাহিনী হেলিওপলিসের যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করল। রোমান সেনাপতি থিওডোরাস যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আলেকজেন্দ্রিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাইজানটাইন শাসনকর্তা সাইরাস ব্যবিলন দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ৬৪১ খ্রিঃ মুসলিম বাহিনী ব্যাবিলন দখল করেন।

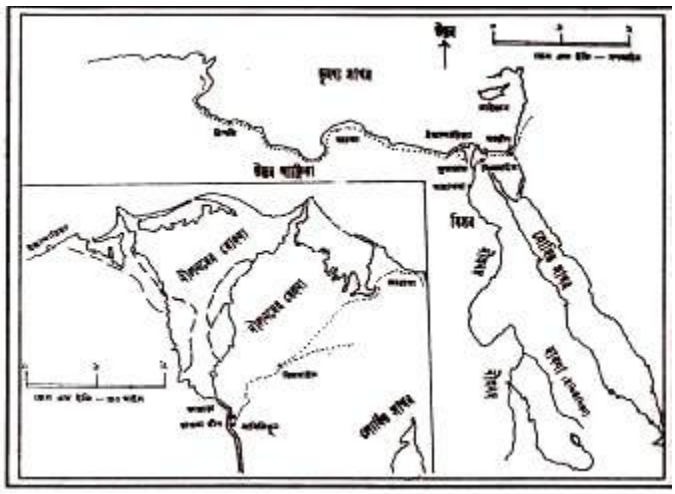

মিসরে মুসলিম সম্প্রসারণ

খ) আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় (৬৪২ খ্রিঃ) ঃ

আমর ইবনে আস বাইজান্টাইনদের বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অধিপতি ছিল থিওডোরাস। তিনি তখন সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করছিলেন। রোমান সম্রাট সিজার্স মুসলিমদের বিরুদ্ধে ৫০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সময় মুসলিম বাহিনীতে ছিল ২০,০০০ জন সৈন্য । যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ৬৪১ সালের ৮ই নভেম্বর।

গুরুত্ব ঃ আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ছিল একটি বিখ্যাত নৌ–ঘাঁটি। পরবর্তীতে হযরত উসমানের সময়কালে মুসলিম নৌবাহিনীর সম্প্রসারণ ঘটে। মুসলিমগণ ভূ-মধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ যেমনঃ সাইপ্রাস, ক্রীট, রোড্স, সিসিলি অধিকার করতে সক্ষম হয়।

মিসর বিজয়ের গুরুত্ব ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

রোমান ভূমি বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিমগণ উর্বর ভূমির দেশ সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর অধিকার করে। কৃষি ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মুসলিমদের উন্নতি সাধিত হয়।

সুয়েজ খাল খনন

খলীফা হযরত উমর (রা.) এর নির্দেশে আমর সুয়েজ খাল খনন করেন। এটি নীলনদের সাথে লোহিত সাগরের সংযোগ স্থাপন করে। এতে নৌ-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

ভূ-মধ্যসাগরে মুসলিম আধিপত্য

মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম নৌবাহিনীর উন্নতি সাধিত হয়। মুসলিমগণ ভূ-মধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। এর বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়।

ফুসতাত নগরীর পত্তন

আমর ইবন আল-আস (রা.) বর্তমান কায়রোর নিকটবর্তী আল-ফুসতাতে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। এটিই পরবর্তীকালে বিখ্যাত ফুসতাত নগরী রুপে পরিচিত হয়।

বার্কা ও ত্রিপলী বিজয়

আমর ইবন আল-আস (রা.) আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় (ইফ্রিকিয়া) অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বার্কা ও ত্রিপলী ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জয় করেন। এই অঞ্চলের খ্রিস্টানরা কর দিতে সম্মত হয় এবং সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উমর (রা.) এর শাসনকাল ছিল মুসলিম ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। তাঁর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। সাসানিয়ান ও বাইজানটাইন সভ্যতার পতন ঘটে। ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে, আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেষ্ঠ মুসলিম সেনাপতি খালিদ, মুসান্না, আবু ওবায়দা, সাদ এবং আমরের নৈপুণ্যে ইসলামী পতাকা দুইটি মহাদেশে উত্তোলিত হয়। এই সকল বিজয়ের মূল অনুপ্রেরণা ছিলেন খলীফা হযরত উমর (রা.)। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বিরাট সাফল্য অর্জন করে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক হতে মুসলিমগণ ভিনদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পারস্য চূড়ান্তভাবে বিজয় অর্জিত হয় কোন যুদ্ধের মাধ্যমে?

ক) বুয়ায়েবের যুদ্ধ খ) কাদিসিয়ার যুদ্ধ গ) জালুলার যুদ্ধ ঘ) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ

২. মিসর বিজয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে কেন ?

ক) মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য খ) মুসলিম সাম্রজ্যের পরিধি বৃদ্ধির জন্য
গ) নবী (স.) এর অছিয়ত পূরনের জন্য ঘ) খ্রিস্টানদের দমনের জন্য

৩. মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের প্রধান কারণ-

i) সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান ii) মুসলিম দূতকে হত্যা
iii) নৌবাহিনী গঠন
নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii, iii খ) ii, iii গ) i, ii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক আব্দুল করিম শ্রেণিকক্ষে একজন খলীফার রাজত্বকাল আলোচনা করেন যিনি পারস্য, সিরিয়া, জেরুজালেম মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করে বিজয় অর্জন করেন। তাঁর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

ক) কোন খলীফার সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয় ? ১
খ) হযরত উমর (রা.) এর পারস্য অভিযানের কারণ কী ছিল ? ২
গ) হযরত উমর (রা.) কীভাবে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য দখল করেন ? ৩
ঘ) হযরত উমর (রা.) এর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছিল-ব্যাখ্যা কর ? ৪

পাঠ-৬.৮ হযরত উমর (রা.) এর প্রশাসনিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উমর (রা.) এর শাসন প্রণালী সম্পর্কে জানবেন।
- বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে জানবেন।
- তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজস্ব, বিচার ও সামরিক বিভাগ সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	জবাবদিহিতামূলক শাসন, বায়তুল মাল, মজলিশ-উশ-শূরা, উমর (রা.) এর দিওয়ান ও হিজরী সন প্রবর্তন

মুসলিম শাসকদের মাঝে হযরত উমর (রা.) ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য ও বিচক্ষণ। তিনিই মূলত মুসলিম শাসনপ্রণালীর প্রকৃত প্রবর্তক। তিনি শুধু সুবিশাল ভূখণ্ডের শাসক ছিলেন না, তিনি এইসব বিজিত অঞ্চলে সুশাসনও কায়েম করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে S.M Imamuddin বলেন, æ He was not only a great conqueror but also classed for all time, among the best of rulers and most successful of national leaders."

হযরত উমর (রা.) এর শাসন প্রণালী ঃ

ক) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) ছিলেন একজন গণতান্ত্রিক শাসক। রাসূল (স.) যে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর প্রবর্তন করেছিলেন, হযরত উমরের সময়ে তা বিকশিত হয় পরিপূর্ণভাবে। তাঁর শাসনাধীন রাষ্ট্রে সকল মুসলিমদের সমান অধিকার ছিল। জিম্মি ও অমুসলিম প্রজারা জিযিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করতো। প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল। তাঁর শাসনপ্রণালী ছিল জবাবদিহিতামূলক। প্রত্যেক জণগণের অধিকার ছিল খলীফার কর্মকাণ্ডের উপর সমালোচনা করা। খলীফা যাতে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টি করতে না পারেন সে জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ছিল।

রাষ্ট্র পরিচালনা হত পরামর্শ সভার সকল সদস্যদের অভিমতের উপর ভিত্তি করে। সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হত। ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ছিল রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি। বায়তুল মাল ছিল সম্পূর্ণরূপে জনগণের সম্পত্তি। খলীফা এ থেকে ন্যূনতম ভাতা গ্রহণ করতেন।

খ) মজলিস আল শূরা

পরামর্শ ব্যতিত কোন রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। এই পরামর্শ সভার অনুমোদন ব্যতীত খলীফা এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। এটি দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। যথা:

- মজলিস আল-আম বা সাধারণ পরিষদ রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত এই সভায় নেওয়া হত। এখানে সাধারণ জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হত।
- মজলিস আল-খাস বা বিশেষ পরিষদ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন ঃ কাজী বা বিচারক নিয়োগ, প্রাদেশিক গভর্ণর, সামরিক বাহিনীর প্রধান ইত্যাদি নিয়োগের সিদ্ধান্ত এই সভায় নেওয়া হত। খলিফা, বিশিষ্ট সাহাবী, হাদীস বিশারদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

গ) কেন্দ্রীয় শাসন

কেন্দীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি ছিলেন স্বয়ং খলীফা হযরত উমর (রা.)। তিনি কেন্দ্রের শাসন পরিচালনা করতেন। অভিজ্ঞ সাহাবীগণ ছিলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা(রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তিনি প্রাদেশিক গভর্ণরদের যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতেন।

ঘ) প্রাদেশিক শাসন

খলীফার শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রকে ১৪টি প্রদেশে ভাগ করে। প্রদেশগুলো হচ্ছে ঃ
১. মক্কা ২. মদীনা ৩. সিরিয়া ৪. বসরা ৫. কুফা ৬. ফারস ৭. কিরমান ৮. খুরসান ৯. মিসর ১০. ফিলিস্তিন ১১. মাকরান ১২. সিজিস্তান ১৩. আজারবাইজান ১৪. আল-জাজিরা।

ঙ) আল-ওয়ালী ও আল-আমিল

১. প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন প্রদেশপাল নিয়োগ করেন। প্রদেশপালকে বলা হত আল-ওয়ালী।
২. প্রত্যেক প্রদেশকে খলীফা অসংখ্য জেলায় বিভক্ত করেন। জেলার প্রধান ব্যক্তিকে আমিল বলা হতো। যথাক্রমে ওয়ালী এবং আমিল তাদের নিজ নিজ কাজের জন্য খলীফার নিকট দায়ী থাকতেন। প্রত্যেক হজ্ব মৌসুমে খলীফা তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হতেন। ওয়ালী ও আমিলগণ তাদের অঞ্চলে আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। তারা ছিলেন সামরিক প্রধান ও রাজস্ব সংগ্রাহক, প্রদেশ ও জেলার প্রধান বিচারক।

চ) কৃষি ও বাণিজ্য সংস্কার

খলীফা হযরত উমর (রা.) কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি জায়গীর প্রথা বিলোপ করেন, কৃষিতে কৃষকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেন। সেচের ব্যবস্থা করেন জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতার উপর কর ধার্য করেন। বাঁধ সংস্কার ও খাল নির্মাণ করেন। তার নির্দেশে আমর ইবন আল আস (রা.) মিসরে সুয়েজখাল খনন করেন যা ৮০ বছর কার্যকরী ছিল। তিনি বণিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করেন।

ছ) আদমশুমারী

হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম পরিকল্পিত ভাবে আদমশুমারী করার ব্যবস্থা করেন। রাজস্ব বন্টন ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে ভাতা প্রদানের জন্য এটি ছিল একটি বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ।

জ) রাজস্ব প্রশাসন

হযরত উমরের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল যুগান্তকারী একটি সংস্কার। সুষ্ঠু রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের আয়ের উৎস বৃদ্ধি পায়, সম্পদের সমবন্টন সম্ভব হয়। রাজস্বের বিভিন্ন উৎসগুলো ছিল যথাক্রমে-

যাকাত ঃ সকল সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর যাকাত প্রদান ফরজ ছিল। কোন মুসলিম ব্যক্তির যদি গচ্ছিত সম্পদের পরিমান ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য মূল্যের সমান হয় এবং তা যদি এক বছর গচ্ছিত থাকে তবে তার জন্য যাকাত প্রদান করা ফরজ।

জিযিয়া ঃ এটি ছিল নিরাপত্তামূলক কর। মুসলিম রাষ্ট্রের বসবাসকারী অমুসলিম প্রজারা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করত।

গনিমাহ ঃ এটি ছিল যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য-সামগ্রী যার ১/১০ অংশ বায়তুল মালে রাখা হত এবং অবশিষ্ট ৯ ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যের মধ্যে বন্টন করা হতো।

খারাজ ঃ এটি ছিল ভূমিসর। মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজারা উৎপন্ন শস্যের ১/২ থেকে ১/৫ অংশ খারাজ প্রদান করত।

ওশর ঃ এটি মুসলিম প্রজারা উৎপন্ন শস্যের ১/১০ অংশ রাষ্ট্রের কোষাগারে প্রদান করতেন।

আল ফাই ঃ এটি ছিল রাষ্ট্রের খাসজমির (Crown land) আয়। এটি জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা হতো।

উশুর ঃ এটি ছিল বাণিজ্য কর । বাণিজ্যিক শুল্ক হিসেবে এটি মুসলিম বণিকদের কাছ হতে ২.৫ % ও অমুসলিম বণিকদের কাছ থেকে ৫% এবং বিদেশী বণিকদের কাছ হতে ১০% আদায় করা হতো।

ঝ) দিউয়ানুল খারায

রাষ্ট্রে বিভিন্ন উৎস থেকে রজস্ব সংগ্রহ এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণের জন্য খলীফা দিউয়ানুল খারায বা রাজস্ব বিভাগ নামে একটি প্রশাসনিক বিভাগ চালু করেন। এটি রাজস্ব সংগ্রহ ও রাষ্ট্রীয় কাজে এর ব্যয় এবং সুষম বন্টন নিশ্চিত করতো।

ঞ) বায়তুল মাল পুনর্গঠন

খলীফা হযরত উমর (রা.) বায়তুল মাল সংস্কার করেন। এটি ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান। সমস্ত রাজস্ব ও রাষ্ট্রীয় আয় এই কোষাগারে জমা হতো। এটি হতে পরবর্তীতে খলীফা ভাতা প্রদান করতেন।

ট) ভাতা প্রদান

সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীর বেতন পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ খলীফা তালিকা অনুসারে ভাতা (Pension) হিসেবে বন্টন করতেন। এটিতে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। যথা-

- প্রথম স্তর: মহানবী (সা.) এর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যগণ;
- দ্বিতীয় স্তর: বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ;
- তৃতীয় স্তর: আবিসিনিয়ার হিজরতের পূর্বে ইসলাম কবুলকারীগণ;
- চতুর্থ স্তর: মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীগণ;
- পঞ্চম স্তর: সেনাবাহিনী পরিষদের সদস্যবৃন্দগণ;
- ষষ্ঠ স্তর: সাধারণ দুস্থ নারী-পুরুষ ও শিশু;
- সপ্তম স্তর: মক্কা বিজেয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারীগণ

মূলত এটি 'উমরের দিওয়ান' নামেই সমধিক পরিচিত।

ঠ) বিচার ব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) এর বিচার ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন। সুশাসন ও ন্যায় বিচার রক্ষা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী আইন কানুন ও শরিয়ত মোতাবেক বিচার কার্য পরিচালিত হত। আইনের চোখে সকলেই ছিল সমান, এমন কি খলীফার এর উর্ধ্বে ছিলেন না। কাজী-উল-কুযাত ছিলেন প্রধান বিচারপ্রতি।

পুলিশ বিভাগ

অপরাধ দমন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য খলীফা পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করেন। তিনি জেলখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।

গোয়েন্দা বিভাগ

খলীফার শাসনামলে তদন্ত ও গোয়েন্দা বিভাগও প্রবর্তিত হয়। এ বিভাগ খলীফার চোখ ও কান হিসেবে বিবেচিত হত।

ড) সামরিক বিভাগ

সামরিক বিভাগ ছিল রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রে ৯ টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন। ১) মদিনা ২) কুফা ৩) বসরা ৪) মিসর ৫) ফুস্তাত ৬) দামেস্ক ৭) হিম্স ৮) ফিলিস্তিন ৯) মসুল। সামরিক বিভাগকে বলা হত দিউয়ান আল জুন্দ। সামরিক অফিসার ও সৈন্য গণ পারিশ্রমিস পেতেন। সেনা বাহিনী অগ্র, পশ্চাৎ, মধ্যভাগ, ডান ও বাম হস্তে বিভক্ত ছিল। আমিরুল আশরাফ, কায়িদ ও আমির ছিল সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের অফিসার।

হিজরি সনের প্রবর্তক

খলীফা হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম হিজরী সনের প্রবর্তন করেন।

জনকল্যানমূলক কাজ

তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সংস্কার সাধন করেন। সেচ ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, চিকিৎসাকেন্দ্র, সরাইখানা, মসজিদ, ইত্যাদি নির্মাণ করেন।

সারসংক্ষেপ:

খলীফা উমর (রা.) ইসলামের ইতিহাসে æUmar the Great" বা মহান উমর নামে পরিচিত। তিনি তাঁর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ নমুনা স্থাপন করে গেছেন। তাঁর রাষ্ট্রকাঠামো ছিল আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুষম। মহানবী (সা.) এর পর তিনি ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়ক। তাঁর দেখানো রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসন পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণ আংশিক অনুসরণ করে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হযরত উমর (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা ছিল-

ক) একনায়কতান্ত্রিক
খ) স্বৈরতান্ত্রিক
গ) গণতান্ত্রিক
গ) রাজতান্ত্রিক

২. খলীফা উমর রাষ্ট্রকে প্রদেশে ভাগ করেন-

ক) শাসনকার্যের সুবিধার জন্য
খ) বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্য
গ) নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে
ঘ) জনগণের ইচ্ছা পূরণের জন্য

৩. হযরত উমর (রা.) শাসন প্রণালীর কোন কোন ক্ষেত্র সংস্কার করেন।

i) প্রশাসন ব্যবস্থা
ii) রাজস্ব ব্যবস্থা
iii)সামরিক ব্যবস্থা

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii
খ) i, ii
গ) ii, iii
ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

মেয়র 'ক' এর শাসননীতিতে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়। তিনি গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজান। তাছাড়া রাজস্ব ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা প্রভৃতির সংস্কার করেন। শাসনকার্যে নিয়োজিত সকল স্তরের লোকদের তাদের দায়িত্ব পালনের উপর জোর দেন। এভাবে তাঁর এলাকায় তিনি একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।

ক) হযরত উমর (রা.) তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে ভাগ করেন ? ১
খ) হযরত উমর (রা.) আদমশুমারির প্রবর্তন করেন কেন ? ২
গ) মেয়র 'ক' প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করেন। উমর (রা.) এর প্রশাসন ব্যবস্থাও কি সুশৃঙ্খল ছিল? ৩
ঘ) প্রশাসনিক সংস্কারক হিসেবে উমর (রা.) কতটুকু সফল ছিলেন লিখুন। ৪

পাঠ-৬.৯ হযরত উমর (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খলীফা উমর (রা.) এর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে জানবেন।
- তাঁর কৃতিত্বসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**জেরুজালেম, বায়তুল মাল, আরব অভিজাত্য, হিজরী সাল, যিম্মি, জিযিয়া কর, আদমশুমারী ও মুসলিম মনীষী**

খলীফা উমর (রা.) শাসনকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় একটি অধ্যায়। তিনি ছিলেন অনুপম চারিত্রিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তার চারিত্রিক গুণাবলী কিংবদন্তী হয়ে আছে। অপর দিকে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসংগঠক। তাঁর রাষ্ট্রসংস্করণ, প্রশাসনযন্ত্র ও জনকল্যাণমূলক কাজ পৃথিবীর ইতিহাসে তাকে 'Umar the Great' হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে।

চারিত্রিক নৈপুণ্য ঃ

সহজ-সরল খলীফা

খলীফা উমর (রা.) ছিলেন তৎকালীন বিশ্বে অর্ধ-পৃথিবীর শাসক। তথাপি তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। সকল প্রকার ভোগ-বিলাস থেকে তিনি দূরে থাকতেন। সামান্য ভাতা তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিতেন। তাঁর আহার ছিল শুকনো রুটি ও খেজুর। তাঁর পরিধেয় একটি মাত্র জামা ছিল। তাতে ছিল অসংখ্য তালি। তিনি খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে পৃথিবী শাসন করতেন। কথিত আছে, পারস্য যোদ্ধা হরমুজ বন্দী অবস্থায়, খলিফাকে মদীনা মসজিদের মেঝেতে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করতে দেখে আশ্চার্যান্বিত হন। অর্থাৎ অর্ধ-পৃথিবীর মালিক নিজেকে সকল প্রকার ভোগ-লালসা ও আরাম-আয়েশ থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন।

প্রজাদরদী শাসক

খলীফা উমর (রা.) ছিলেন প্রজাদরদী শাসক। তিনি নিজে রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে মদীনার রাস্তায় ঘুরে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখতে যেতেন। নিজ কাধে খাদ্য দ্রব্য বয়ে নিয়ে দুঃখীদের ঘরে পৌছে দিতেন। জেরুজালেম যাওয়ার পথে নিজ ভৃত্যকে একবার উঠের পৃষ্ঠে বসিয়ে নিজে লাগাম ধরে জেরুজালেম পৌঁছেন। রাতে অসহায় বেদুঈন স্ত্রীকে সাহায্যের জন্য নিজ স্ত্রী কুলসুমকে ধাত্রী হিসেবে মহিলার নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

ন্যায় বিচারক

হযরত উমর (রা.) ছিলেন ন্যায় বিচারক শাসক। তিনি আইনের স্বাধীনতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করেন। যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে কাজী হিসেবে নিয়োগ করেন। মদ্যপানের অপরাধে নিজ পুত্রকে ৮০ টি বেত্রাঘাত করেন। খালিদকে তার সম্পত্তির হিসাব প্রদান করতে নির্দেশ দেন। অমান্য করলে খলীফা তাকে পদচ্যুত করেন। খ্রিস্টান নাগরিক জাবালকে তার ভৃত্যের সাথে নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

ইসলামের সেবক

খলীফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবক। ইসলামের আদর্শকে তার শাসনে সমুন্নত রাখেন। মহানবী (সা.) এর আদর্শকে তিনি পূর্ণরুপে অনুসরণ করেন।

মানবতা ও সাম্য ঃ তাঁর অন্যতম চারিত্রিক গুণ হল মানবতাবোধ ও সাম্য। তিনি সকল প্রজার অধিকার নিশ্চিত করেন। সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ দূর করেন।

মমত্ববোধ

প্রজার প্রতি মমত্ববোধ আর পক্ষপাতহীন আচরণ এবং সম্পদের প্রতি অনীহা তাঁর চরিত্রকে অদ্বিতীয় করে রেখেছে।

হযরত উমরের কৃতিত্ব

হযরত উমর (রা.) শুধুমাত্র একজন প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি।

শ্রেষ্ঠ বিজেতা

খলীফা উমর (রা.) ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা। তিনি তৎকালীন বিশ্বে মহাপরাক্রমশালী বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেন। তার সেনা বাহিনী মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ছিলেন অর্ধ পৃথিবীর অধিপতি। এই প্রসংগে P.K Hitti বলেন, æ The conquest of the world receving its impulse under abu-Bakr reached its high water-mark under Umar...”

শ্রেষ্ঠ নরপতি

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর প্রশাসন ছিলো অত্যন্ত যুগোপযোগী ও প্রজারঞ্জক। তাঁকে বলা হয় Administrative genius (প্রশাসনিক প্রতিভা)। তিনি তাঁর প্রশাসনের ক্ষেত্রে মেধার সমাদর করেছিলেন। তিনি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করেন। প্রশাসনে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার করে প্রজাদের জন্য উপযোগী করেন।

সামরিক দক্ষতা

খলীফা নিজে একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর অধীনে মুসলিম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিরা নতুন নতুন রাজ্য বিজয় করেছিল। সেনাপতি খালিদ (রা.), আমর ইবন আল আস (রা.), আবু উবায়দা (রা.), সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ছিলেন প্রতিভাবান সমরনায়ক। তাঁর সময়ে সামরিক প্রশাসনে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়।

গণতন্ত্রী শাসক

খলীফা উমর (রা.) ছিলেন একজন গণতান্ত্রিক শাসক। গণতন্ত্রকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি মজলিস-আল-শুরা প্রবর্তন করেন। পরামর্শ ছাড়া তিনি রাষ্টীয় কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না।

আরব আভিজাত্যকে রক্ষা

হযরত উমর (রা.) অন্যতম কৃতিত্ব ছিল আরব আভিজাত্যকে রক্ষা। তিনি বিজিত অঞ্চলে কোন মুসলিমকে জমি ক্রয় করতে ও বসবাস করতে নিষেধ করেন। তিনি খাঁটি আরব রক্তের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

তিনি বায়তুল মালকে পুনর্গঠন করেন। এর অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করেন। ইসলামের আইন মোতাবেক ৬টি উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করেন। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

যিম্মিদের অধিকার

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম যিম্মিদের অধিকার সংরক্ষণ করেন। তারা জিযিয়া করের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কতিপয় সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা ভোগ করত।

কৃষি সম্প্রসারণ ও হিজরী সাল প্রবর্তন

খলীফা উমর (রা.) শাসনকালে কৃষি ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এর উন্নতির পথ সুগম হয়। তিনি সময় গণনার সুবিধার্থে হিজরী সাল প্রবর্তন করেন।

আদমশুমারী ও ভাতা পদ্ধতি

হযরত উমর (রা.) ক্রমানুসারে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করেন এবং এ লক্ষে আদমশুমারীর ব্যবস্থা করেন।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ ও নারী অধিকার

দাসপ্রথার উচ্ছেদ ও যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির পেছনে হযরত উমর (রা.) এর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল। তিনি সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ

খলীফা ইসলামের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ করেন। তাঁর সময় বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র কুফা, বসরা, ফুস্তাত নগরীর পত্তন ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন মুসলিম মনীষী এই সকল শহরে শিক্ষা লাভ করেন ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন।

সারসংক্ষেপঃ

ইসলামের মহান খলীফা উমর (রা.) ছিলেন পৃথিবীর সকল মানুষ ও নরপতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তার চারিত্রিক মাধুর্য, সহনশীলতা, সত্যবাদিতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ইসলামের ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। তিনি ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত পক্ষে তিনিই মূলত আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন খলিফাকে 'Administrative Genius' বলা হয় ?

ক) হযরত আবু বকর (রা.) খ) হযরত উমর (রা.)
গ) হযরত উসমান (রা.) ঘ) হযরত আলী (রা.)

২. খলীফা উমর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রধান পদ থেকে বরখাস্ত করেন-

ক) যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন বলে খ) সম্পত্তির হিসাব প্রদানে অপরাগ হয়েছিলেন
গ) শত্রুর প্ররোচনায় ঘ) নিজের কৃতিত্ব বজায় রাখতে

৩. হযরত উমর (রা.) এর শাসনকালে-

i) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ii) সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে
iii) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়
নিচের কোন্‌টি সঠিক
ক) i, ii খ) ii, iii
গ) i, ii, iii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

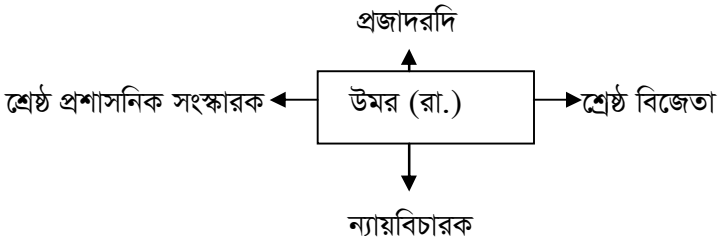

ক) কোন খলীফা হিজরী সাল প্রবর্তন করেন ? ১
খ) উমর (রা.) কেমন জীবন যাপন করতেন ? ২
গ) উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফাকে ন্যায় বিচারক হিসেবে মূল্যায়ণ করুন ? ৩
ঘ) "হযরত উমর (রা.) সকল নরপতির জন্য আদর্শ" উক্তিটি মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.১০ হযরত উসমান (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা.)-এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানবেন;
- হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত লাভের পূর্বে ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান সম্পর্কে জানবেন ও
- হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফত লাভ সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	**'গণী' , কুরাইশ বংশ, যুন্নুরাইন, আবিসিনিয়ায় হিজরত ও মদীনায় হিজরত**

প্রাথমিক জীবন ঃ ইসলামের তৃতীয় খলীফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তিনি আনুমানিক ৫৭৩ বা ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফ্ফান ও মাতা ছিলেন আর্ওয়া। তাঁর ডাকনাম ছিল যথাক্রমে আবু আমর ও আব্দুল্লাহ। তাঁর পবিরার ছিল অত্যন্ত ধনী তিনি শৈশবে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি অল্প বয়স থেকেই কাপড়ের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি প্রভূত সম্পদের অধিকারী হন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তাই তার নামের শেষে 'গণী' (সম্পদশালী বা ধনী) উপাধি যোগ করা হয়। তিনি ইতিহাসে উসমান গণী নামে সমধিক পরিচিত। হযরত উসমান (রা.) এর পূর্বপুরুষ ও রাসূল (সা.) এর পূর্ব পুরুষ একই ধারা থেকে আগত। পরবর্তীকালে মক্কার তত্ত্বাবধানকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং কুরাইশ বংশ হাশেমী এবং উমাইয়া এই দুটি উপগোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত উসমান (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুহাম্মদ (সা.) যখন ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন, তখন তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন (৩৪ বছর)। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার সাথে তাঁর দেখা একটি স্বপ্নের ঘটনা জড়িত। একদা রাতে উসমান (রা.) স্বপ্নে এক মহান শক্তির দ্বারা আদিষ্ট হলেন-"ওগো ঘুমন্ত ব্যক্তি, জেগে ওঠ, মক্কায় আহমদ আগমন করেছে।" এই স্বর্গীয় বাণী তাঁর হৃদয়কে বিগলিত করে দিল। তিনি রাসূল (সা.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার চাচা হাকাম (পরবর্তীতে আবু জেহেল) ছিলেন, ইসলামের ঘোর বিরোধী। সে হযরত উসমান (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। তাঁকে গাছের সাথে বেঁধে বেদম প্রহার করে কিন্তু শত অত্যাচার সয়ে তিনি দ্বীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হননি। হযরত উসমান (রা.) ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাসূল (সা.) এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে বিয়ে করেন। তাই তাঁকে বলা হয় 'যুন্নুরাইন' বা দুই-নূরের অধিকারী। রাসূল (সা.) উম্মে কুলসুমের মৃত্যুর পর বলেছিলেন যে- "আমার যদি আরেকটি কন্যা থাকতো তাহলে আমি তাকেও হযরত উসমান (রা.) এর সাথে বিবাহ দিতাম"।

খিলাফতের পূর্বে ইসলামের সেবা ঃ

আবিসিনিয়ায় হিজরত ঃ যখন ক্রমেই ইসলামের প্রসার হতে শুরু করলো, সেই সাথে মুসলিমদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার, যুলুম বেড়ে যেত লাগলো। তখন মহানবী (সা.) এর নির্দেশে কতিপয় সাহাবী তাদের পরিবারসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। তিনি সেখানে দুই বছর অবস্থান করেন। এরপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ৬২২ খ্রিঃ মদীনায় হিজরতের পরে মহানবী (সা.) এর সাথে মিলিত হন।

অর্থ-সম্পদ ইসলামের উদ্দেশ্যে দান ঃ হযরত উসমান (রা.) তাঁর উপার্জিত অগাধ অর্থ প্রাচুর্য ইসলামের উদ্দেশ্যে অকাতরে দান করেন। মদীনার মুসলিমদের পানীয় জলের কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি ২০,০০০ দিরহাম মূল্যের বীর রুমা কূপটি ক্রয় করে দেন। এটি ছিল মদীনার একমাত্র পানির কূপ, যা ছিল এক ইহুদীর মালিকানায়। মহানবী (সা.) মদীনায় মসজিদে নববী সম্প্রসারনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি এর সংলগ্ন জমি ক্রয় করে দেন। তাবুক অভিযানের সময় মহানবী (সা.) যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য সকলের নিকট আহবান জানালে তিনি নগদ ১০০০ দিনার, ১০০০ উট ও ৭০ টি ঘোড়া এবং সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করেন। এতে রাসূল (সা.) তার উপর অত্যন্ত প্রীত হন এবং খুশি হয়ে বলেন, " আজকের পর যদি উসমান (রা.) এ জাতীয় কোন ভাল কাজ নাও করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই।"

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ বদর যুদ্ধে হযরত উসমান (রা.) অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তখন তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া অসুস্থ ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.) এর আদেশে যুদ্ধযাত্রা হতে বিরত থাকেন। এছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ

করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের সময় রাসূল (সা.) এর নির্দেশে তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মক্কার কুরাইশদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে যান।

ওয়াহী লেখক ঃ হযরত উসমান (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর অন্যতম প্রধান ওয়াহী লেখক। তিনি এই ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তিনি তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচনে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি মজলিস-আল-শুরার পরামর্শের প্রতি আহবান জানান। তিনি উসমান (রা.), আলী (রা.), তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন আউফ ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে নিয়ে গঠিত পরিষদের মধ্যে থেকে তৃতীয় খলীফা নির্বাচনের আহবান জানান। উপরে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তি খিলাফতের জন্য যোগ্য ছিলেন। ইসলামের প্রতি সকলেরই অসামান্য ত্যাগ ও অবদান রয়েছে। তবে খিলাফতের গুরু দায়িত্ব সর্বাপ্রেক্ষা যোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পিত হওয়া আবশ্যক। হযরত আলী (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.) এর জামাতা ও চাচাতো ভাই। তিনি বীরযোদ্ধা, জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন। খিলাফতের উপর তাঁর দাবী ছিল স্পষ্ট। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন কিন্তু তিনি পূর্বেই খিলাফতের গুরুদায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করেন। যুবায়ির (রা.) হযরত উসমানকে সমর্থন করলেন। আব্দুর রহমান এই সময় মক্কা থেকে আগত হজ্জ পালনকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করলেন। সকলেই হযরত উসমান (রা.) এর পক্ষে রায় দিলেন। এভাবে হযরত উমর (রা.) এর ইন্তিকালের পর ৪র্থ দিনে হযরত উসমান (রা.) ইসলামের তৃতীয় খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তালহা (রা.)এই সময় মদীনার বাইরে অবস্থান করছিলেন। তিনি মদীনায় এসে যখন শুনলেন সকলেই এই নির্বাচন সমর্থন করেছে, তখন তিনিও হযরত উসমান (রা,) কে সমর্থন করলেন। তারপর একে একে সবাই খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন। এই প্রসংগে W. Muir বলেন, æ It led to dissensions which for years bathed the Muslim world in blood."

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উসমান (রা.) ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল যথাক্রমে 'গণী' এবং যুননুরাইন। তিনিই প্রথম আবিসিনিয়াতে হিজরত করেন। ইসলামের সেবার জন্য তিনি তাঁর ধন-ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর খলীফা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। যা পরবর্তীতে ইতিহাসের অনেক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গনী শব্দের অর্থ কী?
ক) দানশীল খ) বিশ্বাসী গ) ধনী ঘ) দয়ালু

২. হযরত উসমান (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকেন কেন ?
ক) মহানবী (সা.) এর নির্দেশে স্ত্রী-রুকাইয়ার অসুস্থতার জন্য খ) নিজ ইচ্ছায়
গ) নিজের অসুস্থতার জন্য ঘ) আবিসিনিয়ায় গমন করার কারণে

৩. হযরত উসমান (রা.) এর দানশীলতার প্রমাণ বহন করে-
i) নবীজী (সা.) এর মেয়েকে বিয়ে ii) রুমা কূপ ক্রয় iii) তাবুক যুদ্ধে ১০০০ দিনার দান
নিচের কোন্‌টি সঠিক
ক) i, ii, iii খ) i, ii গ) ii, iii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হবিপুর গ্রামের মোড়ল আব্দুর রহিমের মৃত্যুর পর কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতিতে মোড়ল নির্বাচনের সভা বসল। সভায় চার পাঁচজন যোগ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হল। তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিদ্বান, গ্রামের কল্যাণে যার অবদান বেশি এমন ইউনুস মিয়াকে মোড়ল নির্বাচন করা হলো। বাকী সবাই তার নির্বাচনকে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

ক) হযরত উসমান (রা.) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন ? ১
খ) হযরত উসমান (রা.) কে যুননুরাইন বলা হয় কেন ? ২
গ) "উপরোক্ত ঘটনাটি উসমান (রা.) এর খলীফা নির্বাচন হওয়ার ঘটনা স্মরণ করায় এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা.) এর খলীফা নির্বাচনের ঘটনাটি লিখুন । ৩
ঘ) ইসলামের সেবায় হযরত উসমান (রা.) এর অবদান মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.১১ হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা.) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- অভিযোগসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ও
- সার্বিক পর্যালোচনার শেষে আপনি এর ভিত্তিহীনতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**এশিয়া মাইনর, স্বজনপ্রীতি, কুরআন সংকলন, বায়তুল মাল, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, কাবাগৃহ সম্প্রসারণ ও ধর্মভীরু**

হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতকাল ছিল (৬৪৪-৬৫৬) অর্থাৎ ১২ বছর। এই ১২ বছরের খিলাফত কালকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। এর প্রথম ছয় বছর (৬৪৪-৬৫০) খ্রিঃ তিনি পূর্বাঞ্চল ও মধ্য এশিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন। পারস্যে বিদ্রোহ দমন করে মুসলিমরা খুরাসান, নিশাপুর, মার্ভ, বলখ, তুখারিস্থান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করতে সমর্থ হয়। অপর দিকে এই সময়ে এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া , ত্রিপলী ও সাইপ্রাস মুসলিম অধিকারে আসে। এই ছয় বছর ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিজয়ের কাল। তাঁর শাসনকালের শেষের ছয় বছর (৬৪০-৬৫৬) ঠিক তার বিপরীত স্রোত বইতে শুরু করে। রাজ্যময় অসন্তোষ, বিশৃংখলা দেখা দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ আরোপ করা হয়। অভিযোগগুলো নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

ক) স্বজনপ্রীতি

তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগ ছিল স্বজনপ্রীতি। অভিযোগে বলা হয় যে, তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশিষ্ট সাহাবী ও জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তির পরিবর্তে তাঁর নিজ পরিবারের অযোগ্য আত্মীয় স্বজনদের নিয়োগ করেন। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ- হিট্টি, মুইর, ভন ক্রেমার এবং সৈয়দ আমীর আলী ও মাসুদীও এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এর ফলে কুফা, বস্‌রা ও মিসরের লোকেরা তার উপর বিশেষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

১) কুফা ঃ পারস্য বিজয়ী সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে খলীফা উমর (রা.) কুফার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলে তাঁর স্থলে মুগীরাকে কুফার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু মৃত্যু শয্যায় হযরত উমর (রা.) এর ইচ্ছা অনুযায়ী সাদ (রা.)কে পুনরায় তাঁর পূর্বপদে নিয়োগ দান করা হয়। কিছুকাল পরে বায়তুল মালের অর্থ নিয়ে সাদ (রা.) ও কোষাধ্যক্ষ মাসুদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে, সাদ কিছুটা দোষী প্রমাণিত হয় এবং খলীফা উসমান (রা.) তাকে পদচ্যুত করেন। তাঁর স্থলে ওয়ালিদ বিন ওকবাকে নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে ওয়ালিদ ছিলেন খলীফার সৎ ভাই। তিনি মদ্যপানের দোষে সাব্যস্ত হলে, তাকে পদচ্যুত ও বেত্রাঘাত করা হয়। তার স্থলে জনগণ সমর্থিত সাঈদ-আল-আসকে কুফার শাসনপদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাঈদও ছিলেন খলীফার আত্মীয়। এভাবে তিনি কুফাবাসীর বিরাগভাজন হন।

২) বসরা ঃ আবু মুসা আনসারী ছিলেন খলীফা উমর কর্তৃক নিয়োজিত বসরার শাসকর্তা। তিনি উসমান (রা.) এর শাসনকালের ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা অতি নগণ্য একটি অভিযোগ পেশ করে, যেটি ছিল অসাম্যের অভিযোগ। খলীফা তাকে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে আবদুল্লাহ ইবনে আমীরকে শাসক হিসেবে নিয়োজিত করেন। আব্দুল্লাহ ছিলেন খলীফার পিতৃব্য পুত্র। তিনি সুশাসক ছিলেন। তার সময়ে পারস্যের বিদ্রোহ দমন করা হয়। মার্ভ, নিশাপুর প্রভৃতি অঞ্চল মুসলিম অধিকারে আসে। কিন্তু তিনি খলীফার পরিবারভুক্ত হওয়ায় বিদ্রোহীরা তাকে সুনজরে দেখেননি।

৩) মিসর ঃ মিসর জয় করার পর সেনাপতি আমর ইবন আল আস খলীফা হযরত উসমানের অধীনে ৬৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে মিসরের রাজস্ব কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ ইবন সাদ ইবনে আবি সারাহ এর সাথে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয়। তখন খলীফা আমর এর স্থলে তার দুধভাই আব্দুল্লাহকে মিসরের গভর্ণর করে পাঠান। যদিও আব্দুল্লাহ একজন সফল গভর্ণর ছিলেন, তাঁর সময়ে রোমান আধিপত্য খর্ব করে কার্থেজ পর্যন্ত মুসলিম অধিকারে আসে তথাপিও বিদ্রোহীরা তাকে অপসারণের দাবী করে। তখন খলীফা বাধ্য হয়ে তার স্থলে বিদ্রোহীদের সমর্থিত মুহাম্মদ-বিন-আবু-বকরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

সিরিয়া ঃ এই সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন সিরিয়ার গভর্ণর, যিনি হযরত উমর (রা.) আমলে নিয়োজিত হন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ রাজনৈতিক ও যোগ্য শাসক কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনিও উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর নিকট আত্মীয় ছিলেন। তাই হযরত উসমান (রা.) যখন মুয়াবিয়া (রা.) কে যোগ্যতার জন্য স্বপদে বহাল রাখেন তখন বিদ্রোহীরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। তারা এর প্রতিবাদ জানায়।

সমালোচনা-পর্যালোচনা ঃ

ক) স্বজনপ্রীতি

হযরত উসমান (রা.) রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে তার নিজস্ব আত্মীয়কে নিয়োগ দান করলেও তারা সবাই ছিলেন উক্ত পদের উপযুক্ত ও সময়ের বিচারে অন্যদের তুলনায় অধিকতর যোগ্য। তিনি মূলত রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই তাদের উক্ত পদের জন্য নির্বাচন করেন। তিনি যদি স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিতেন তাহলে তিনি বিদ্রোহীদের কোন কথাই শুনতেন না। তিনি তাদের চাহিদা মোতাবেক অনেক আত্মীয়কে পদ হতে অপসারণ করেছিলেন। জনগণের পছন্দের ব্যক্তিকে তাদের শাসনকর্তারূপে নিয়োগ দিয়েছেন এমনকি মদ্যপানের অভিযোগে একজনকে বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদান করেছিলেন। তার শাসনকালের প্রথম ৬টি বছর ছিল শান্তি ও শৃংখলার কাল। কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্ভাগ্যবশত তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয় যা ছিল অমূলক।

খ) কুরআন শরীফ দগ্ধীভূত করণ

খলীফা উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের একটি অভিযোগ হচ্ছে তিনি কুরআন শরীফ দগ্ধীভূত করেন। কিন্তু যথাযথভাবে পর্যালোচনা করলে এই ঘটনার ভ্রান্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলামের সম্প্রসারণ হয়। এতে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল যেমন-আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় কুরআন শরীফের পাঠ আবৃত্তি ও উচ্চারণ প্রণালীতে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে মত পার্থক্য দেখা দেয়। তাই এ বৈচিত্র্য দূর করার জন্য ও কুরআনের উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য হযরত উসমান (রা.) কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। তিনি ৬৫১ খ্রি. যায়েদ বিন-সাবিত (রা.)এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কুরআনের বিশিষ্ট হাফিজগণ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটির উদ্যোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলো হস্তগত করা হয়। কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপি রাসূল (সা.) এর অন্যতম স্ত্রী ও হযরত উমর (রা.) এর কন্যা বিবি হাফসার নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়। এতে দুই পাণ্ডুলিপির মধ্যে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অত:পর এই সকল ভ্রান্তিপূর্ণ কুরআনের কপিসমূহ ভস্মীভূত করা হয়। সেই সাথে মূল পাণ্ডুলিপি সমগ্র সাম্রাজ্যে এক কপি করে প্রেরণ করা হয়। এই ঘটনাকে বিদ্রোহীরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং খলীফার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ আনে।

সমালোচনা ঃ কুরআন সংকলনের কাজ ছিল নিঃসন্দেহে একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সকলেই খলীফার এই কাজের প্রশংসা করেন। এই জন্য খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর উপাধি দেওয়া হয় 'জামিউল কুরআন' অর্থাৎ কুরআন সংকলনকারী। কিন্তু অন্যায়ভাবে মুসলিমদের উত্তেজিত করার প্রয়াসে বিদ্রোহীরা তার বিরুদ্ধে কুরআন ভস্মীভূত করার মত অবান্তর অভিযোগ আনেন।

গ) বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎকরণ

বিভিন্ন পাশ্চাত্য ঐতিহাসকিগণ খলীফা উসমান (রা.) এর উপর অমিতব্যয়ীতার অভিযোগ এনেছেন। তাদের মতে, তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অর্থ-সম্পদ নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করেন। এর ফলে রাজকোষের অর্থের সংকট দেখা দেয়। এই অভিযোগের ফলে জনগণ খলীফার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে বাস্তবতা এই যে, উমাইয়া বংশের কতিপয় লোক যেমন-সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর সিরিয়ার সকল ভূ-সম্পত্তি ও জাতীয় সম্পদ নিজ অধিকারভুক্ত করেন। তবে এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে খলীফার অজ্ঞাতসারে। খলীফা এটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই মুয়াবিয়া (রা.) এর ব্যক্তিগত দোষের ভাগিদার খলিফাকে করা সমীচীন নয়।

সমালোচনা ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলীফা ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন স্বনামধন্য ধনী ব্যক্তি। তাঁর চরিত্র ছিল সরল ও মহানুভব। তিনি তাঁর নিজস্ব সম্পদ হতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে সম্পদ বিলিয়ে দিতেন। অন্যদিকে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে। খলীফা বায়তুল মাল হতে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকল প্রয়োজন নিজস্ব সম্পদ হতে ব্যয় করতেন। তাই খলীফার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক।

ঘ) আবু জার আল–গিফারীর নির্বাসন

আবু জার আল-গিফারী একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু ও জ্ঞানতাপস। হযরত উসমান (রা.) এর সময়ে এসে কতিপয় মুসলিম দুনিয়ার জীবনের প্রতি মোহ বিশিষ্ট হয়ে পড়ে। প্রভূত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে আরম্ভ করে। ফলে অনেকেই আরাম-আয়েশ ও অপচয়ের পথ বেছে নেয়। এতে করে আবু জার আল-গিফারী সম্পদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি প্রচার করেন যে, ধন সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য নয়, তা জনগণের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য। যারা সম্পদ সঞ্চয় করবে তাদের স্থান হবে নরকে। বস্তুত এটিই ছিল একটি গোঁড়া সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। কৌশলী মুয়াবিয়া (রা.) তাকে সিরিয়া হতে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এখানে তার এই মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে খলীফা তাকে বোঝাতে চাইলেন যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করা অন্যায় নয়। কিন্তু তিনি খলীফার সাথে দ্বিমত হলেন এবং এই ধরণের উচ্চাভিলাষী পরিবেশে থাকতে অস্বীকার করলেন। এক পর্যায়ে খলীফা বাধ্য হয়ে তাকে 'রাবাবা' নামক স্থানে নির্বাসিত করেন।

সমালোচনা

দুর্ভাগ্যবশত নির্বাসনের মাত্র দুই বছর পর আবু জার আল-গিফারী সেখানে মারা যান। তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁর মতবাদকে সামনে রেখে বিদ্রোহীরা খলীফার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু তখন খলীফা যা করছিলেন তা মূলত মদীনায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজকে প্রশ্রয় দেননি। তাই আবু জার আল-গিফারীকে তিনি নির্বাসিত করেছিলেন।

সরকারী চারণভূমি ব্যবহার

সরকারী চারণভূমি ব্যবহার করা ছিল জনগণের এখতিয়ারের বাইরে। যুদ্ধে ব্যবহৃত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুকে এই সরকারী চারণভূমিতে চরানো হতো যা ছিল জনগণের জন্য নিষিদ্ধ। যুদ্ধে ব্যবহৃত এই সকল গবাদি পশু ছিল সরকারী সম্পত্তি তাই খলীফা সরকারি চারণভূমি ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, তিনি ব্যক্তিগত গবাদি পশুর জন্য উক্ত চারণভূমি ব্যবহার করেছিলেন। এতে করে তাঁর বিরুদ্ধে জনগণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

সমালোচনা ঃ এই অভিযোগটি ছিল সম্পূর্ণ অমূলক। খলীফার নিজস্ব পশু নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উক্ত চারণভূমি ব্যবহার করেছিলেন।

চ) কাবাগৃহ সম্প্রসারণ

খলীফা হযরত উমর (রা.) এর সময়ে কাবাগৃহের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়, এবং তা হযরত উসমান (রা.) এর আমলে শেষ হয়। এই কাজের জন্য কাবাগৃহ সংলগ্ন অনেক ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ করা হয়। হযরত উমর (রা.) এর সময়ে কেউ জমির মূল্য দাবি করেনি, কিন্তু হয়রত উসমান (রা.) এর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই জমির মূল্য দাবি করেন। পরবর্তীতে খলীফা জমির মূল্য পরিশোধ করতে চাইলে জমির মালিকগণ তা নিতে অস্বীকার করে। তারা রাজ্যের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। শান্তি বজায় রাখার জন্য খলীফা তাদের কারারুদ্ধ করেন। এতে করে বিদ্রোহীরা খলীফার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে।

সমালোচনা

এই ছিল সম্পূর্ণরুপে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। খলীফা উসমান জমির মালিকদের উপযুক্ত অর্থ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা বিশৃংখলা করার অভিসন্ধি করে এবং খলীফার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করে।

চ) ভাতা বন্ধ

তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি অমূলক অভিযোগ ছিল কতিপয় ব্যক্তির ভাতা বন্ধ করে দেওয়া যা ছিল কেবলমাত্র একটি ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা। আদুল্লাহ ইবনে মাসুদ ও হযরত উবাই (রা.)এর ভাতা ভুল বোঝাবুঝির কারণে বন্ধ করে দেন। তবে খলীফা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের ইন্তিকালের পর তাঁর প্রাপ্য ভাতা তাঁর উত্তরাধিকারীকে পৌঁছে দেন।

বিদ্রোহীদের অভিযোগ ছিল মিথ্যা

এই সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা রকম অভিযোগ আসতে শুরু করলে খলীফা পরবর্তী হজ্ব মৌসুমে রাষ্ট্রের সকল গভর্ণরকে মদীনায় এক হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এই সভায় বিদ্রোহী ও অভিযোগকারীদেরও আসার জন্য বলা হয়। যথাসময়ে প্রদেশিক গভর্ণররা মদীনার সভাতে উপস্থিত হলেও বিদ্রোহীরা কেউই উপস্থিত হলেন না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বিদ্রোহীদের অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ রুপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

এই সময় সভার ব্যক্তিবর্গ খলীফার নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষী ও পাহারাদার নিয়োগ ও বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও উদার প্রকৃতির। তাই তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে চাইলেন না। তাঁর জন্য কোন প্রকার দেহরক্ষীর প্রয়োজনীয়তাও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা হযরত উসমান (রা.) ছিলেন একজন আদর্শ খলীফা। যার প্রমাণ আমরা তাঁর শাসনকালের প্রথম ৬ বছরে লক্ষ করি। তাঁর সময়ে মুসলিম রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হয়। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু তাঁর ধর্মভীরুতা ও চারিত্রিক কোমলতার জন্য এই সময় তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ আসতে থাকে যার সবগুলোই ছিল ভিত্তিহীন। শুধুমাত্র রাষ্ট্রে বিশৃংখলা ছিল তাদের দূরভিসন্ধি। তাইতো খলীফা তাদের দাবি মেনে নেয়ার পরও তারা বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আবু জার আল-গিফারির মতবাদ কোন ধরণের ছিল ?

ক) সমাজতান্ত্রিক খ) গণতান্ত্রিক
গ) রাজতান্ত্রিক ঘ) বৈপ্লবিক

২. হযরত উসমান (রা.) অমিল ও অসামঞ্জস্যহীন সমস্ত কুরআনের কপি পুড়িয়ে ফেলেন কেন ?

ক) রাষ্ট্রের কুরআনের আবৃত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য
খ) সকলকে মূল কুরআনের অনুলিপি পাঠ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার জন্য
গ) হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত উমরের আদেশ মান্য করার জন্য
ঘ) সকলের মাঝে কুরআনের শিক্ষা সঠিকভাবে দান করার জন্য

৩. হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

i) স্বজনপ্রীতি ii) বিলাসিতা iii) বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ

নিচের কোন্‌টিসঠিক

ক) i, ii খ) i, ii, iii গ) i, iii ঘ) ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

হোসেন আলী কলেজের অধ্যাপক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় একজন খলীফার খিলাফতকাল বর্ণনা করেন। তাঁর খিলাফতকালে ইসলামের বিস্তৃতির সুসময় বলে মনে হলেও তাঁর খিলাফতকালের শেষের দিকে মদীনায় বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা খলীফার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অমূলক অভিযোগ এনে বিদ্রোহ শুরু করে। খলীফার বিরুদ্ধে এসকল অভিযোগ ও বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত।

ক) ইসলামের তৃতীয় খলীফা কে ? ১
খ) উসমান (রা.) কে 'জামিউল কুরআন' বলা হয় কেন ? ২
গ) উপরে উল্লিখিত বর্ণনা যে খলীফার সময় নির্দেশ করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। ৩
ঘ) "উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো অমূলক" ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৬.১২ হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার ঘটনা ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার কারণ সম্পর্কে জানবেন।
- হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে জানবেন।
- হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম বিশ্বে এর কী প্রভাব পড়েছিল তা সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	**উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব, গণতান্ত্রিক শাসন, কুরাইশ ও অকুরাইশ দ্বন্দ্ব, সীমান্ত যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও রাজতান্ত্রিক খিলাফত**

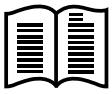

হযরত উসমান (রা.) এর উপর আনীত অভিযোগ সমূহের উপর ভিত্তি করে বিদ্রোহীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খলীফা তখন তাদের প্রতি উদার মনোভাব প্রকাশ করেন। কারণ তিনি মুসলিমদের মাঝে এই বিভক্তি চাননি। কিন্তু তার এই শিথিলতার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে তার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার কারণসমূহ

১) উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব

প্রাক-ইসলামী যুগের আরবের উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব, যা মক্কার রক্ষণাবেক্ষণকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছিলো তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উমাইয়ারা ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা বিজয়ের সময়। হযরত উমর (রা.) পর্যন্ত এই দুই গোষ্ঠী লোকের মধ্যে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু উমাইয়া বংশের লোক হযরত উসমান (রা.) যখন খিলাফত গ্রহণ করেন, তখন হাশিমী গোত্র তা সহ্য করতে পারলো না। বিশেষ কওে হযরত আলী (রা.) এর পন্থীরা। তাই সেই প্রাচীন আরবীয় গোত্রের কলহ তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

২) কুরাইশ ও অকুরাইশ দ্বন্দ্ব

ইসলাম সম্প্রসারণে সকল মুসলিম কুরাইশদের সাথে সম্মিলিত ভাবে প্রাণপণ যুদ্ধ করে। কিন্তু তাদের সুযোগ সুবিধার প্রতি খলীফার দৃষ্টি সমানভাবে ছিল না। ক্ষমতা শুধু কুরাইশকেন্দ্রিক থাকবে এই ধারণাও অকুরাইশদের মনঃপুত হয়নি। উসমান (রা.) হযরত উমরের আরবীয় আভিজাত্য নীতি হতে সরে আসলেন, বিজিত অঞ্চলে কুরাইশরা তাদের বসতি স্থাপন শুরু করে। এতে করে কুরাইশ ও অকুরাইশদের মধ্যে নানান বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

৩) ইবনে সাবার অপপ্রচার

এমন অনেক লোক ছিলো যারা ইসলামকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন ইয়েমেনের এক নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহুদি সন্তান। বসরার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরের হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সে প্রচার করতে থাকেন যে, হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.) এর একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী। সুতরাং খিলাফতের অধিকার একমাত্র তারই। সে বসরা ও কুফায় এই মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এ সকল প্রদেশের শাসকগণ তাকে নিজ নিজ শহর হতে বিতাড়িত করেন। তারপর সে মিসরে গমন করে এবং কতিপয় ব্যক্তির সমর্থন লাভ করে। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন হাকিম বিন-জাবালা ও মুহাম্মদ বিন-আবু বকর। তার এই অপপ্রচারের ফলে বসরা, কুফা ও মিসরে খলীফা বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

৪) আনসার-মুহাজির দ্বন্দ্ব

মহানবী (সা.) মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু খলীফা (রা.) এর শাসনামলে আনসারদের তুলনায় মুহাজিরদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদ হতে বঞ্চিত করা হয়। এতে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

৫) অমুসলিমদের অসন্তোষ

বিভিন্ন বিধর্মী সম্প্রদায় যেমন ইহুদি, খ্রিস্টান, মাজিয়ান তারা সব সময়ই ছিল ইসলাম-বিরোধী। তারা রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও ইসলামের বিরোধীতা শুরু করে। কুরাইশদের উচ্চপদ লাভ তাদের মধ্যে ঈর্ষাকাতরতা সৃষ্টি করে। তারাও বিদ্রোহীদের সমর্থন করতে থাকে।

৬) কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ

বিদ্রোহীরা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় শাসনে অনভ্যস্ত যাযাবর আরব জাতি এই শাসন মেনে নিতে পারেনি। হযরত উসমান (রা.) এর শাসনের শেষ ছয় বছর সীমান্ত যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গণিমাতের উৎস বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের অয়ের অন্যতম উৎস ছিল আল ফাই ভূমি যা হযরত উমর (রা.) এর সময়ে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। এই কারণে আরব যোদ্ধারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং তারা আল ফাই ভূমির আয় দাবি করে। এই দাবি ছিল সম্পূর্ণরুপে বিদ্রোহী মনোভাব ও অযৌক্তিক। খলীফা উসমান (রা.) বহুলাংশে হযরত উমর (রা.) এর রাজস্ব নীতি পরিবর্তন করলেও তিনি এই দাবি মেনে নিতে পারেন নি। তাই সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

৭) মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক নীতি

মারওয়ান ছিল খলীফা উসমান (রা.) এর চাচাতো ভাই। তার অতীত ছিল কদর্যপূর্ণ। একবার বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে রাসূল (সা.) তাকে মদীনা হতে বহিষ্কার করেন। সে খলীফার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হস্তক্ষেপ করেন। এই স্বার্থপর ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে উমাইয়াদের নিয়োগ করেন। হাশিমীদের সকল প্রকার ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখাই ছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য। মারওয়ানের এই ধ্বংসাত্মক নীতি খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি হিসেবে কাজ করে।

হত্যার ঘটনা

পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন অভিযোগ ও কারণ সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ হতে (কুফা, বসরা ও মিসর) প্রায় ৭০০ বিদ্রোহী মদীনায় এসে উপস্থিত হন। তারা প্রাদেশিক গভর্ণরদের বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ পেশ করেন। খলীফা তাদের নিকট দ্রুত এই প্রতিকারের ওয়াদা প্রদান করেন। পথিমধ্যে নিজ নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় কুচক্রী মারওয়ান কর্তৃক প্রেরিত এক হাবশি দূতের হাতে খলীফা সীলমোহরসহ একটি পত্র বিদ্রোহীরা হস্তগত করেন। উক্ত পত্রে লিখা ছিল নিজ-নিজ প্রদেশের রাজধানীতে পৌঁছামাত্রই যেন বিদ্রোহীদের হত্যা করা হয়। মূলত এই পত্রটি ছিল মারওয়ানের হস্তে লেখা এবং এতে খলীফার সীল অন্যায়ভাবে মারওয়ান নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। এতে বিদ্রোহীরা ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং মদীনায় ফিরে গিয়ে উক্ত পত্রের কৈফিয়ৎ দাবি করে। খলীফার আল্লাহর শপথ নিয়ে দাবি করেন যে, তিনি কোনভাবেই এই পত্র তৈরির আদেশ করেননি। এত বিদ্রোহীরা মারওয়ানের কূটচাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং মারওয়ানকে তাদের হাতে হস্তান্তরের জন্য দাবি জানায় কিন্তু খলীফা তাদের এই দাবী গ্রহণ করতে পারেনি। তখন বিদ্রোহীরা খলিফাকে অযোগ্য ঘোষণা করে এবং তার বাসগৃহ অবরোধ করে। খলীফার নিরাপত্তার প্রতি উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত আলী, তালহা, যুবায়ের ও তাদের পুত্রদ্বয়ের সমন্বয়ে ১৮ জনের একটি দেহরক্ষী বাহিনী খলীফার বাসগৃহে পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এই সময় হজ্জের মৌসুমের শেষ হতে শুরু করে। তাই মদীনার লোকজন ফিরে আসার আগেই বিদ্রোহীরা খলিফাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তারা সম্মুখ দরজার পাহারাদারদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হলে দেয়াল টপকে ছাদের মাধ্যমে খলীফার গৃহে প্রবেশ করে। ৮২ বছরের বৃদ্ধ খলীফা এই সময় পবিত্র কুরআন পাঠে নিয়োজিত ছিলেন। মুহাম্মদ বিন আবু-বকর খলীফার দাড়ি ধরে টান দেন। খলীফা এই সময় তাকে তাঁর পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে মুহাম্মদ বিন আবু বকর সেখান হতে দূরে সরে গেলেন। অত:পর অপর বিদ্রোহীরা খলীফাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। খলীফা স্ত্রী নায়লা তাদের বাধা দিতে এগিয়ে এলে তাঁর হাতের তিনটি আঙ্গুল কেটে যায়। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৬৫৬ খি ঃ ১৭ ই জুন (১৮ ই জিলহজ্ব, ৩৫ হিজরী)।

হত্যার ফলাফল ঃ

বিদ্রোহের/গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঃ হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইসলামে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ এবং কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ছিল এই হত্যাকাণ্ডের সুদূরপ্রসারী ফলাফল। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা ও পতনের পরও এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটেনি।

উমাইয়া ও হাশিমী গোষ্ঠীর উদ্ভব

মুসলিমদের ঐক্যে ভাঙ্গনের ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা উমাইয়া ও হাশিমী দলে বিভক্ত হয়ে যায়। উমাইয়া ও হাশিমী দ্বন্দ্ব আরো চরম আকার ধারণ করে।

খিলাফতের মর্যাদাহানি

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট হয়। খিলাফত ছিল জনগণের শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। মহানবী (সা.) এর মহান আদর্শকে টিকিয়ে রাখা ও অনুসরণ করাই ছিল খিলাফতের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে অপঘাতে একজন ধর্মভীরু খলীফার মৃত্যু ঘটে এবং এই ঘটনা খিলাফতের ধর্মীয় মর্যাদাকে ব্যাপকভাবে আঘাত করে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলে, উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তিরোহিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গোড়া পন্থীদের উদ্ভব হয়। মুসলিম জাতি তখন শিয়া, সুন্নি, খারেজী প্রভৃতি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মদীনার প্রাধান্য লোপ

হযরত উসমান (রা.) হত্যাকাণ্ডের পর মদীনার প্রাধান্য লোপ পায়। মদীনা খিলাফতের রাজধানীর মর্যাদা হারায়। পরবর্তী খলীফা হযরত আলী (রা.) কুফায় তার রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে রাজতান্ত্রিক খিলাফতের সময় দামেস্ক, বাগদাদ, কর্ডোভায় রাজধানী স্থাপন করা হয়।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও বিদ্রোহীদের অসন্তোষ, সেই সাথে মারওয়ানের কূটকৌশল খলীফা উসমানের হত্যাকাণ্ডকে প্ররোচিত করে। এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ কারণ। অবশেষে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের পর, মুসলিম বিশ্ব চরমভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হয় নানা ধর্মীয় দল-উপদল সৃষ্টি হয়, সর্বোপরি খিলাফতের মর্যাদাহানি ও গণতন্ত্রের সমাধি ঘটে। তাই এই হত্যাকাণ্ড ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খলীফার সীলমোহর অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছিলো কে?

ক) মারওয়ান খ) ইবনে সাবা

গ) আবু জার-আল গিফারী ঘ) মুহাম্মদ বিন আবু বকর

২. বিদ্রোহীরা মদীনায় এসেছিলো কেন ?

ক) উসমান (রা.) কে হত্যা করতে খ) যুদ্ধ করার জন্য

গ) প্রাদেশিক গভর্ণরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে। ঘ) অনুষ্ঠানে যোগদান করতে

৩. উসমান (রা.) এর হত্যার পেছনে যাদের কর্মকাণ্ড দায়ী ছিল-

i) মারওয়ান ii) মুহাম্মদ বিন আবু বকর iii) ইবনে সাবা

নিচের কোন্‌টি সঠিক-

ক) i খ) i, ii গ) i, iii,iii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

কবিতা তার ইসলামের ইতিহাস বইতে একজন খলীফার জীবনী পড়ার সময় তার হত্যাকাণ্ডের অংশ পড়ে বিস্মিত হয় কেননা এটি খেলাফতের ইতিহাসে প্রথম প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড এবং অনৈতিক। এই হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ক) হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার সময় তাঁর বয়স কত ছিল ? ১

খ) উসমান (রা.) হত্যার পিছনে মারওয়ানের ভূমিকা লিখুন ? ২

গ) উসমান (রা.) হত্যার ঘটনাটি লিখুন ? ৩

ঘ) "উসমান (রা.) এর হত্যার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী" কথাটি ব্যাখ্যা করুন । ৪

পাঠ-৬.১৩ হযরত উসমান (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত উসমান (রা.) এর চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জানবেন।
- হযরত উসমান (রা.) এর কৃতিত্ব সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	**যুন্নুরাইন, জামিউল কুরআন, বায়তুল মাল, জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথা**

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা, মহানবীর ঘনিষ্ঠ সাহাবী। ইসলামের প্রতি তার ত্যাগ ও খেদমত ছিল বর্ণনাতীত। তার শাসনকালের শেষ অংশটি বিবেচনা না করলে তিনি ছিলেন একজন সফল ও কৃতিত্বপূর্ণ শাসক।

চরিত্র ঃ

মহানবী (সা.) এর নিত্যসঙ্গী

হযরত উসমান ছিলেন রাসূল (সা.) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবা, তার একজন নিত্যসঙ্গী, তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে ইসলাম প্রচারে সদা নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তিনি মহানবী (সা.) এর অন্যতম ওয়াহী লেখক ছিলেন।

ইসলামের প্রতি খিদমত

হযরত উসমান (রা.) বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের খিদমত করেন। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর প্রচুর অর্থ সম্পদ বিলিয়ে দেন। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি মদীনায় এক ইহুদির কাছ থেকে রূমা নামক কূপটি ক্রয় করে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করে দেন। তিনি প্রায় দুই হাজার ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। মসজিদে নববী সম্পসারণের জন্য তিনি নিজ অর্থে জমি ক্রয় করে দেন। তাবুক অভিযানের সময় তিনি এক তৃতীয়াংশ সেনা বাহিনীর ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। ১০০০ দিরহাম দান করেন এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০০০ উট দান করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের সময় তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুরাইশদের সাথে সমঝোতা করতে তাদের নিকট গমন করেন।

যুন্নুরাইন উপাধি লাভ

তাঁর উপর রাসূল (সা.) এর স্নেহ ছিল অত্যাধিক। রাসূল (সা.) তাঁর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অপর জনকে হযরত উসমান (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন। এ জন্য তাঁর উপাধি হয় যুন্নুরাইন অর্থাৎ দুই জ্যোতির অধিকারী।

ধৈর্য ও নম্রতা

খলীফা উসমান (রা.) ছিল কোমল চরিত্রের অধিকারী। তাঁর সত্যবাদিতা, নম্রতা ও ভদ্রতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলি তাকে মহানবী (সা.) এর নিকট অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল। তাঁর নম্র স্বভাবের কারণেই বিদ্রোহীদের অভিযোগের মুখে যখন তাঁর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, তবুও তিনি তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করতে পারে নি।

তাঁর সরলতা ও ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে তাঁর নিকট আত্মীয়রা সর্বত্র বিশ্বাস ভঙ্গ করতে শুরু করে। তিনি তাঁর কোন দুর্নীতিগ্রস্থ আত্মীয়র প্রতি কঠোর অবস্থান নিতে পারেন নি। তিনি অযথা রক্তপাত ঘটাতে চাননি। এটি পরবর্তীতে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা হিসেবে প্রকাশ পায়।

সহজ-সরল জীবনধারী

বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও হযরত উসমান (রা.) সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। তাঁর নিজস্ব অর্থ তিনি ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দেন। বায়তুল মাল থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজ ব্যবসার আয় হতে সংসার পরিচালনা করতেন।

হযরত উসমান (রা.) এর কৃতিত্ব ঃ

সামরিক বিজয়

হযরত উসমান (রা.) সামরিক প্রশাসনের দিক থেকে একজন সফল খলীফা ছিলেন। তার শাসনামলের প্রথম ছয় বছর ছিল মুসলিম বিজয় অভিযানের কাল। এই সময় মুসলিম সেনা বাহিনীর অগ্রযাত্রা সুদূর কাবুল ও বেলুচিস্তান হতে পশ্চিমে ত্রিপলী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

নৌবাহিনী গঠন

হযরত উসমান (রা.) এর সময় সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয়। এই আরব নৌবাহিনীর মাধ্যমে মুসলিমগণ ভূমধ্যসাগরে, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে আধিপত্য বিস্তার সক্ষম হয়। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দ্বীপ যেমন- সাইপ্রাস, রোড্স, সিসিলি, ক্রীট প্রভৃতি দখল করা হয়। ভূ-মধ্যসাগরে বাইজানটাইন শক্তিকে কোণঠাসা করা হয়।

কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.) এর অন্যতম কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পবিত্র কুরআন শরীফকে ধারাবাহিক ভাবে সংকলন করা। এই কাজের জন্য তিনি 'জামিউল কুরআন' উপাধিতে ভূষিত হন। কুরআন কে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার কৃতিত্ব তিনি লাভ করেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

তাঁর শাসনামলের প্রথমার্ধ ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার কাল। তিনি কুরআন ও হাদীস অনুসারে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করেন। জনগণের মতামতকে তিনি গ্রহণ করতেন।

পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) ন্যায় হযরত উসমান (রা.) পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। মজলিস-আল-শূরার শাসন প্রণালী তিনি টিকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর রাজধানীতে বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গে নিয়মিত রাষ্ট্রীয় বৈঠকে মিলিত হতেন।

প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ

তিনি প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। তার সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হয়। তিনি সিরিয়ার মত বড় একটি প্রদেশকে ৩টি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেক প্রদেশে একজন গভর্ণর নিয়োজিত ছিল। তিনি ৩টি প্রদেশের জন্য একজন গভর্ণরের উচ্চপদস্থ একজন গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করেন। সাইপ্রাস, রোডস দ্বীপসমূহ কে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বৃহৎ পাঁচটি প্রদেশের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন যথাক্রমে ঃ সিরিয়া- মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, মিসর- আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ, বসরা- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, কুফা- আবু মুসা আল আশ্সারী, কিন্নিসিরিন- মুসলিম ফেহরী।

বায়তুল মাল প্রশাসন

প্রথম দিকে বায়তুল মাল প্রশাসন ব্যবস্থার উপর খলীফার কড়া নযর ছিল। তিনি যোগ্য ব্যক্তিকে এর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন। উকবা বিন আমের ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক, যায়িদ বিন সাবিত (রা.) ছিলেন বিচারপতি।

জনহিতকর কার্যাবলি

হযরত উসমান (রা.) ইসলামের খিদমতে নিজের প্রচুর সম্পদ বিলিয়ে দেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। মদীনার মসজিদ সংস্কার করে তাতে কাঠের ছাদ ও প্রস্তরের স্তম্ভ সংযোজিত করেন। মাহজুর বাঁধ নির্মাণ করে মদীনাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করেন। মদীনায় অবস্থিত 'বনাত লা' ইলাহ নামক খাল থেকে আরমায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এতে উক্ত স্থান চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। তিনি এছাড়া অসংখ্য রাস্তা-ঘাট সংস্কার, মসজিদ নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণও খাল খনন করেন।

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

সামরিক শক্তি হযরত উসমান (রা.) এর শাসনে বৃদ্ধি পায়। তিনি এক্ষেত্রে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর নীতি অনুসরণ করেন। সেনা বাহিনীর ব্যারাক সংখ্যা বৃদ্ধি, যুদ্ধের সরঞ্জাম, ঘোড়া ও উট ইত্যাদির সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন।

জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথার উদ্ভব

হযরত উসমান (রা.) মুসলিমদেরকে বিজিত দেশে জমি ক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। তা না হলে শহর ও গ্রামীণ লোকদের সাম্যতা রক্ষা হত না। শহরের লোকদিগকে গ্রামে বসবাস করতে না দিলেও, গ্রাম থেকে লোকেরা এসে শহরে

বসবাস করছে, এতে করে অনেক অশালীন উপকরণ গ্রাম হতে শহরে চলে আসছিলো। এই আদেশের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জমি ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথার সূত্রপাত হয়।

সারসংক্ষেপঃ

খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর চারিত্রিক কোমলতা, স্বভাবের বিনম্রতা ও ধৈর্যের জন্য ইসলামের ইতিহাসে এক স্বনামধন্য জায়গা দখল করে আছেন। তার মত নম্র সাহাবী আর কেউ ছিলেন না। তার শাসনের বিশৃংখলার সময়টুকু বাদ দিলে তা ছিল পুরোপুরি ইসলামের বিজয় ও সমৃদ্ধির কাল। সুষ্ঠু প্রশাসন যন্ত্র, জনকল্যাণমুখী শাসন আর মুসলিম বিজয় অভিযান ছিল তার শাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। প্রথম আরব নৌবাহিনী গঠন ও সাফল্য অর্জন ছিল ইসলামের ইতিহাসে তাঁর অন্যতম কীর্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. হযরত উসমান (রা.) কত বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন?

ক) ৯২ বছর বয়সে খ) ৮২ বছর বয়সে গ) ৭০ বছর বয়সে ঘ) ৭২ বছর বয়সে

২. খলীফা উসমান (রা.) খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ নির্ধারণ করতেন কিভাবে?

ক) নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খ) জনগণের মতামত অনুযায়ী
গ) কাজির পরামর্শ অনুযায়ী ঘ) মজলিস আল শূরার পরামর্শ অনুযায়ী

৩. খলীফা উসমান (রা.) মদীনা নগরীকে রক্ষা করেন-

i) বিদ্রোহীদের দমন করে ii) খাল খনন করে
iii) বাঁধ নির্মাণ করে

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii খ) i গ) i, ii, iii ঘ) iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

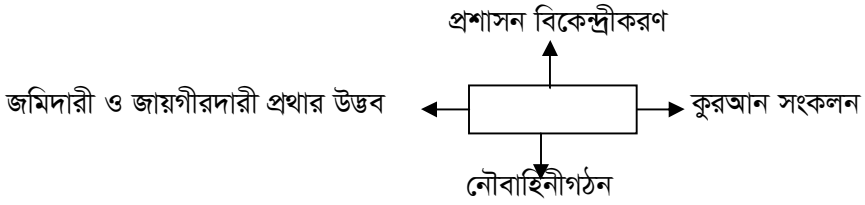

ক.'জামিউল কুরআন' কোন খলীফার উপাধি? ১

খ) উসমান (রা.) কেমন জীবনযাপনর করতেন ? ২

গ) উপরের উদ্ধৃতিতে যে খলীফার কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে তার অবদান লিখুন। ৩

ঘ) জনকল্যাণে উসমান (রা.) এর কৃতিত্ব তুলে ধরুন। ৪

পাঠ-৬.১৪ হযরত আলী (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা.) এর পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানবেন;
- তাঁর ইসলামের প্রতি খিদমত সম্পর্কে জানবেন ও
- তাঁর খিলাফতে নির্বাচনের ঘটনা সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	হাশিমী গোত্র, আবু তোরাব, অসি ও মসি, আমানত, হিজরত, মুসলিম পতাকাবাহী, বীর যোদ্ধা ও কিংবদন্তী বীর।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) ছিলেন ইসলামের ৪র্থ খলিফা। তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের অন্তর্গত হাশিমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের সাল ছিল ৬০০ খ্রিঃ অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর নবুয়্যত লাভের ঠিক দশ বছর পূর্বে। তাঁর পিতা ছিলেন আবু তালিব। সম্পর্কে তিনি রাসূল (সা.) এর চাচাতো ভাই। তার শৈশবে ডাক নাম ছিল আবু তোরাব ও আবুল হাসান। রাসূল (সা.) এর শৈশবে যেমন তার চাচা আবু তালিব তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঠিক তেমনি চাচার অস্বচ্ছল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) এর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তাই রাসূল (সা.) এর সকল চারিত্রিক আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ছোট বেলা হতেই হযরত আলী (রা.) এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

ইসলাম গ্রহণ ঃ

৬১০ খ্রিঃ আলী (রা.) এর যখন মাত্র ১০ বছর বয়স তখন রাসূল (সা.) নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। রাসূল (সা.) আহবানে হযরত খাদীজা (রা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম কবুল করার পর, হযরত আলী (রা.) ছিলেন বালকদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি শৈশবেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি নযিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

ইসলামের সেবা ঃ

হযরত আলী (রা.) খুবই বালক বয়সে ইসলাম কবুল করেন। তিনি অর্থ সম্পদ দিয়ে ইসলামের সেবা না করতে পারলেও ইসলামের সেবায় তার কোন ঘাটতি ছিলো না। তিনি তাঁর জ্ঞান-বিদ্যা ও শৌর্য-বীর্য দ্বারা ইসলামের সেবা করে গেছেন। তাঁর দশ বছর বয়স হতেই তিনি রাসূল (সা.) এর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তে অসি ও মসি ছিল তাঁর ইসলামের সেবার মাধ্যম।

তিনি রাসূল (সা.) এর সার্বক্ষণিক সাথী ছিলেন। মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচার যখন চরম পর্যায়ে পৌছায় তখন মহানবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ হতে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তখন রাসূল (সা.) এর নিকট আমানত হিসেবে গচ্ছিত কুরাইশদের বিভিন্ন সম্পদ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা.) কে রাসূল (সা.) বিছানায় শায়িত অবস্থা রেখে যান। কুরাইশরা রাসূল (সা.) এর বিছানায় হযরত আলী (রা.) কে দেখে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়। পরের দিন হযরত আলী (রা.) মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

বিবাহ ঃ

হিজরী প্রথম অথবা দ্বিতীয় বর্ষে ৬২৫ খ্রিঃ হযরত আলী (রা.) রসূল (সা.) এর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে বিবাহ করেন। হযরত আলী (রা.) রাসূল (স.) এর জামাতা হলেন, এতে তাদের ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পেল। হযরত আলী ও ফাতিমার পরিবারে হাসান, হুসায়ন ও মুহসীন নামে তিন পুত্র এবং জয়নাব ও উম্মে কুলসুম নামে দুই কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে মুহসীন বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন। হাসান ও হুসাইনের বংশধর সৈয়দ (নেতা) নামে পরিচিত।

২৯ বছর বয়সে হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) হানাফীয়া গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেন এবং এখানেও তার কয়েকজন পুত্র-কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনুল হানাফিয়া।

হযরত আলীর শৌর্য-বীর্য ঃ

হযরত আলী (রা.) শৈশব থেকেই ছিলেন অসীম সাহসী। তাঁর তেজস্বীতা, শৌর্য-বীর্য তাঁকে বীর পুরুষ হিসেবে পরিচিত করেছে। তিনি ছিলেন অসি চালাতে সিদ্ধ হস্ত, বীর যোদ্ধা, কৌশুলী সমর নায়ক। তাঁর নাম শুনলে কুরাইশদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হত।

রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় সব কয়টি যুদ্ধেই বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (সা.) এর পতাকাধারী সেনাবাহিনীর অন্যতম স্তম্ভ। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি কুরাইশ বীর আমর ইবনে আবদুহকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই যুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ রাসূল (সা.) তাকে 'জুলফিকার তরবারি' উপহার দেন।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম পতাকাবাহী মুসাব ইবনে উমাইয়া নিহত হলে, হযরত আলী (রা.) পতাকা বহনের দায়িত্ব পালন করেন। খন্দকের যুদ্ধেও তিনি অসম বীরত্বের পরিচয় দেন। খাইবার যুদ্ধে তিনি বনু সাদ গোত্রকে পরাজিত করেন, যারা ছিল ইহুদীদের সমর্থক। হুনায়নের যুদ্ধেও তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। তাবুক অভিযানের সময় রাসূল (সা.) এর নির্দেশে তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল খাইবারে সুরক্ষিত কামুস দুর্গ বিজয়। এই দুর্গের ফটক তিনি একাই ভেঙ্গে ফেলেন। যা পরবর্তীতে ৭০ জন যুবক মিলেও বহন করতে পারছিল না। এই বীরত্বপূর্ণ কাজের পর রাসূল (সা.) তাকে 'আসুদল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দেন। হযরত আলী (রা.) ছিলেন হুদাইবিয়ার সন্ধির লেখক। মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আলী (রা.) ইসলামী পতাকা বহন করেন। রাসূল (সা) এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) ইয়েমেনে ইসলাম প্রচার করেন এবং সেখানে ব্যাপক সফলতা অর্জনের পর তিনি ইয়েমেনের কাজী হিসেবে নিয়োজিত হন।

পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি আনুগত্য ঃ

হযরত আলী (রা.) তাঁর পূর্ববতী তিন খলীফার প্রতি সর্বদা আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। হযরত আবু-বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (র.) এর খিলাফত কালে তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা। তিনি মজলিশ-উস-শুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তিনি রিদ্দা যুদ্ধের সময় স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। খিলাফতের নিরাপত্তার নিশ্চিত করে। তিনি নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমকে হযরত উমর (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন। হযরত উসমান (রা.) এর গৃহ-শত্রুপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলে নিজ পুত্রদ্বয়কে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করে। এভাবে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এসেছেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ঃ

৬৫৬ খ্রিঃ ৭ই জুন বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করলে মুসলিম রাষ্ট্রের চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তগুলোর একটি। কেউই খিলাফত-এর দায়িত্ব গ্রহণে তখন এগিয়ে এলেন না। মদীনাবাসী এই সময়ে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে কুফাবাসী যুবাইর (রা.) কে এবং বসরাবাসী তালহা (রা.) কে খলীফা হিসেবে সমর্থন করলো। অপর দিকে এক দল লোক হযরত উসমান (রা.) এর বিচার দাবি করলো। এমতাবস্থায় মিসরের বিদ্রোহীদলের নেতা ইবনে-সাবা হযরত আলীকে খিলাফতের জন্য মনোনীতি করলো। কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরাও এই দাবিকে সম্মতি জানালেন। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিঃ ২৩ শে জুন সকল অবস্থা বিবেচনা করে হযরত আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসংগে Syed Ameer Ali বলেন æThe husband of Fatema united in his person the hereditary right with that of election."

সমালোচনা ঃ

হযরত আলী (রা.) এমন এক সংকটজনক মুহূর্তে খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণ করেন, যখন মদীনা ছিল বিদ্রোহী ও হত্যাকারীদের দখলে। একথা সত্য যে, হযরত আলী (রা.) খিলাফতের যোগ্য দাবিদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর খলীফা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি ছিল অগণতান্ত্রিক। তাই এর ফলাফল পরবর্তীতে ৩টি গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ করা যায়।

সারসংক্ষেপ:

হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর জামাতা ও চাচাতো ভাই। অসামান্য বীর ও শৌর্য বীর্যের প্রতীক। ইসলামের সেবায় তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা ও কিংবদন্তী বীর। খিলাফতের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অপরিসীম। হযরত উসামন (রা.) এর মৃত্যুর পর এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যত চিন্তা করে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামে চতুর্থ খলিফা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আসাদুল্লাহ শব্দের অর্থ কি ?

ক) আল্লাহর তরবারী
খ) আল্লাহর সিংহ
গ) আল্লাহর আর্শিবাদপ্রাপ্ত
ঘ) আল্লাহর প্রিয়

২. হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন বীরপুরুষ কারণ-

ক) তিনি প্রচুর দৈহিক বলের অধিকারী ছিলেন
খ) তিনি বিদ্বান ছিলেন
গ) তিনি সকল যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন
ঘ) তিনি অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত করেন

৩. হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত লাভের পূর্বে নিম্ন বর্ণিত কারনে মুসলিম রাষ্ট্রে বিশৃংখলা ছিল -

i) পূর্ববর্তী খলীফার হত্যার বিচার দাবি
ii) মদীনাবাসীর দল বিভিন্ন দলে বিভক্ত
iii) ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই

নিচের কোন্‌টি সঠিক -

ক) i, iii
খ) i, ii, iii
গ) ii, iii
ঘ) i, ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

'A' নামক খলীফা ইসলামের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে খিলাফত লাভ করেন। পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যুর পর সৃষ্ট বিশৃংখল পরিবেশে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বীরপুরুষ ইসলামের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইসলামে তাঁর অবদান অনন্য হলেও নানা কারণে তাঁর খিলাফত লাভ প্রশ্নবিদ্ধ।

ক) সবচেয়ে কম বয়সে ইসলাম গ্রহণকারী খলীফা কে ? ১
খ) হযরত আলী (রা.) কে কেন 'আসাদুল্লাহ' উপাধি দেয়া হয় ? ২
গ) উপরে উল্লেখিত 'A' খলীফার খিলাফত লাভ সম্পর্কে লিখুন । ৩
ঘ) ইসলামের সেবায় 'A' খলীফার অবদান উল্লেখ করুন। ৪

পাঠ-৬.১৫ উষ্ট্রের যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা.) খিলাফতের প্রাথমিক সংকট সম্পর্কে জানবেন;
- উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ ও ঘটনা সম্পর্কে জানবেন ও
- এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড, সংকটজনক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, জামালের যুদ্ধ, হেজাজ।

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ইসলামী রাষ্ট্রে সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হযরত আলী (রা.) এই সময় বিদ্রোহীদের দ্বারা খলীফা নিযুক্ত হন, যদিও তার খিলাফতে সকলেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এই সময় হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি জানানো হয়। এবং এই প্রেক্ষিতে ইসলামে বেশ কয়েকটি গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল উষ্ট্রের যুদ্ধ।

হযরত আলী (রা.) সংকটসমূহ ঃ

উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ দাবি

খিলাফত লাভ করেই হযরত আলী (রা.) ব্যাপক বিশৃংখলার সম্মুখীন হন। উত্তেজিত জনতা হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করে। কিন্তু কতিপয় কারণে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করা তখন সম্ভব ছিল না। কারণ এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এতে জড়িত ছিল কুফা, বসরা, মিসরের সংঘবদ্ধ একটি গোষ্ঠী। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা সম্ভবপর ছিল না। এছাড়া বিদ্রোহীদের দলনেতা ইবনে সাবা ছিলেন স্বয়ং আলী (রা.) কে খিলাফতে নিযুক্তকারী। তাই তার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এই পরিস্থিতি সকলে সমানভাবে বিবেচনায় আনলেন না। তালহা (রা.), যুবায়ির (রা.), রাসূল (সা.) এর স্ত্রী হযরত আয়িশা(রা.) হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি জানালেন।

প্রশাসনিক রদবদল

এই সময় প্রশাসনিক রদবদল সংকটজনক পরিস্থিতিকে আরো সংকটতর করে তোলে। এক্ষেত্রে খলিফা ইবন-উল-আব্বাস ও আল-মুগীরার উপদেশ অগ্রাহ্য করেন। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার স্থলে সুহাইল ইবনে হানিফাকে নিযুক্ত করেন। বসরার শাসনকর্তা আব্দুল্লা ইবনে-আমীরের স্থলে উসমান বিন হানিফকে, মিসরের কায়েস বিন সাদকে ও কুফায় নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সিরিয়ার শক্তিশালী গভর্ণর মুয়াবিয়া নির্দেশ অমান্য করলো ও আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকার করলো। তিনি হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধচারণ করতে শুরু করেন।

উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড ও হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত লাভ এই যুগপৎ ঘটনার পূর্বেই হাশিমী ও উমাইয়া দ্বন্দ্ব আবারো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলে মুসলিমদের ৩টি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

মুয়াবিয়া (রা.) এর বিরোধিতা ও উচ্চাভিলাষ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর চাচাতো ভাই। তিনি সিরিয়ার একজন কৃতিত্বপূর্ণ ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর রক্তাক্ত জমা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুল তিনি সিরিয়ার মসজিদে প্রদর্শন করেন এবং হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ দাবি করেন। মূলত এটি ছিল একটি রাজনৈতিক স্লোগান এবং এর নেপথ্যে ছিল মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। যার প্রমাণ আমরা উষ্ট্রের যুদ্ধে দেখতে পাই।

উষ্ট্রের যুদ্ধ

এই প্রসংগে Joseph Hell বলেন, æ The muder of Othman was a signal for civil war." মুসলিমদের মধ্যে সংঘঠিত প্রথম গৃহযুদ্ধ ছিল উষ্ট্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বীজ হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নিহিত ছিল।

কারণ

বিশিষ্ট সাহাবীদ্বয় তালহা (রা.) ও যুবায়ির (রা.) যদিও হযরত আলী (রা.) এর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন, কিন্তু হত্যাকারীদের বিচারে খলীফার বিলম্ব তাদেরকে হতাশ ও অসন্তুষ্ট করেছিল; হযরত উসমান কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হযরত আলী (রা.) অপসারণ করলে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়; সৈয়দ আমীর আলীর মতে-তালহা ও যুবায়ের যথাক্রমে বসরা ও কুফার শাসনভার গ্রহণের জন্য খলীফার নিকট প্রস্তাব করলে, খলীফা তাদের এই দাবি নাকোচ করে দেন। এতে তারা খলীফার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়; কোন কোন ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, হযরত আলী (রা.) এর সাথে হযরত আয়িশা(রা.) এর ব্যক্তিগত মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু তা সঠিক নয়। যদিও তাদের মাঝে একদা ভুল বোঝাবুঝি হয়, কিন্তু বিবি আয়িশাহযরত আলী (রা.) এর উপর কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল না। তিনি পরিস্থিতির চাপে, খলীফার শিথিল ভাব দেখে মক্কায় ফেরার পথে বিদ্রোহী তালহা ও যুবায়ের এর সাথে যোগ দেন। তিনি উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করতে চেয়েছিলেন।

যুদ্ধের ঘটনাবলী

যুদ্ধটি ৬৫৬ খ্রিঃ সংঘটিত হয়। তালহা ও যুবায়ের মক্কা ও মদীনা হতে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে বসরা দখল করেন। বিদ্রোহীদের সাথে বিবি আয়িশাঅংশগ্রহণ করেন। বসরার শাসনকর্তা উসমান বিন হানিফকে হত্যা করা হয়। এখানে কতিপয় ব্যক্তিকে যারা উসমান হত্যায় জড়িত ছিলেন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়। খলীফা আলী (রা.) কুফার পথে বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কুফার শাসক আবু মুসা আনসারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে খলিফাকে সাহায্য করতে রাজি না হলে তিনি পদচ্যুত হন। ৯০০০ কুফাবাসী হযরত আলী (রা.) এর সাথে যোগদান করেন। বস্রায় হযরত আলী তালহা, যুবায়ের ও বিবি আয়েশার সাথে সাক্ষাৎ করেন, এবং আলোচনার মাধ্যমে এই সংকট এড়াতে উদ্যোগী হন। এতে তালহা (রা.), যুবায়ির (রা.) ও বিবি আয়িশা (রা.) সম্মত হন। কিন্তু বিদ্রোহীরা বিচলিত হয়ে রাতের অন্ধকারে উভয় শিবিরে অতর্কিত আক্রমণ চালালে, উভয় পক্ষ বিস্মিত হলেন। তারা পরস্পরকে আক্রমণের জন্য দায়ী করেন। প্রত্যত্তুরে হযরত আলী (রা.) অশ্বপৃষ্টে এবং হযরত আয়িশা (রা.) উস্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে তালহা ও যুবায়ের বসরার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন এবং পথিমধ্যে দুইজন আততায়ী দ্বারা নিহত হয়। এবার যুদ্ধে হযরত আয়িশা(রা.) উস্ট্রকে লক্ষ করে বিপরীতপক্ষ আক্রমণ করলো। হযরত আয়িশা (রা.) যুদ্ধ থামাতে অসমর্থ হলেন। হযরত আলী (রা.) এর আদেশে বিবি আয়িশা (রা.)এর উটের পা কর্তিত হয়, হযরত আলী (রা.) বহু কষ্টে যুদ্ধ থামিয়ে বিবি আয়িশা(রা.)কে উদ্ধার করেন এবং তার ভ্রাতা মুহাম্মদ বিন আবু বকরের সাথে ৪০ জন মহিলার সহচার্যে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এরপর হযরত আয়িশা (রা.) জীবনে আর কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এই যুদ্ধে হযরত আয়িশা(রা.) এর বাহন উটটি আক্রান্ত হয় বলে, ইতিহাসে এই যুদ্ধ উষ্ট্রের বা (জামালের যুদ্ধ) নামে পরিচিতি লাভ করে। আরবীতে একে বলা হয় জংগে জামাল বা জামালের যুদ্ধ। আরবী জামাল অর্থ উট।

যুদ্ধের ফলাফল

উষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমেই ইসলামে গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় সাড়ে চার হাজার মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। তবে এই যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বসরা, কুফা, মক্কার মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান ঘটে। বসরা, কুফা ও মিসরে হযরত আলী (রা.) এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সিরিয়ায় তখনো মুয়াবিয়ার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় থাকে। খলীফা কায়েস বিন সাদকে মিসরে, সুহাইল ইবনে-হানিফকে হেজায এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বসরার শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন।

অন্যদিকে বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রকে কেন্দ্রস্থল হতে শাসন করার জন্য এবং ইরাকীদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে খলীফা মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে ৬৫৭ খ্রিঃ কুফায় স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) কে এই সিদ্ধান্তের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। মদীনা রাষ্ট্র তার রাজধানীর মর্যাদা হারায়। আর খলীফা আলী হারালেন বিশিষ্ট সাহাবীদের সমর্থন।

সারসংক্ষেপ:

উষ্ট্রের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মূলত হযরত উসমান (রা.) হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীরাই জয়ী হয়েছিল। এই যুদ্ধটি ছিল মূলত ভুল বোঝাবুঝি এবং শত্রুপক্ষের প্ররোচনার ফল। হযরত আলী (রা.) এবং তালহা (রা.), যুবায়ির (রা.) ও বিবি আয়িশা (রা.) কেউই এই অযথা রক্তপাত মূলক যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা সকলেই পরিস্থিতির শিকার হন এবং এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা পরবর্তী ইতিহাসে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১) উষ্ট্রের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর কোন স্ত্রী যুদ্ধ করেন।?

ক) খাদিজা (রা.) খ) হযরত আয়িশা (রা.)

গ) উম্মে সালমা ঘ) উম্মে কুলসুম

২) হযরত আলী (রা.) খিলাফত অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমেই উসমান (রা.) হত্যার বিচার করতে অস্বীকৃতি প্রদান করেন কেন ?

ক) খিলাফতে ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায়

খ) খিলাফতে গৃহযুদ্ধ ও হানাহানি বৃদ্ধির আশঙ্কায়

গ) তার সন্তানদের বিপদে পড়ার আশঙ্কায়

ঘ) হত্যাকারীরা অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ায়

৩) উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ-

i) হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী ii) আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন প্রকাশের দাবি

iii) হযরত আয়িশা(রা.) এর সন্তুষ্টি

নিচের কোন্‌টি সঠিক-

ক) i খ) i, ii

গ) ii, iii ঘ) i, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

জমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে রহিম ও করিম দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ বাধে। এক পর্যায়ে রহিমের মৃত্যু হলে তার পরিবারবর্গ এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালায়। এতে ইন্ধন যোগায় গ্রামের মোড়ল ইসহাক। ফলে বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে।

১. মুসলিমদের মধ্যে সংগঠিত **১ম** গৃহযুদ্ধ কোনটি? ১

২. "উস্ট্রের যুদ্ধ" নামকরণ করা হয় কেন ? ২

৩. উপরের উদ্দীপকটি যে যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয় সে যুদ্ধের কারণগুলো উল্লেখ করুন। ৩

৪. উষ্ট্রের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করুন ? ৪

পাঠ-৬.১৬ সিফফিনের যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জানবেন।
- সিফফিনের যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানবেন।
- খারেজী সম্প্রদ্রায় ও আলীর মধ্যে সংঘটিত নাহরাওনের যুদ্ধ সম্পর্কে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মোড় পরিবর্তনকারী, রাজতন্ত্র, উসমানের রক্তাক্ত জামা, বাজেয়াপ্ত, মল্লযুদ্ধ, অভিনব কৌশল, দুমাতুল জন্দল, খিলাফত বিভক্তি, খারেজী সম্প্রদায়।**

হযরত আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। আলী ও মুয়াবিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের আদর্শের চ্যুতি হয় এবং ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। মূলত এই দ্বন্দ্বের সূত্র ধরেই খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট হয়, গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর সমাধি রচিত হয়। সেই সাথে সূত্রপাত হয় রাজতন্ত্রের। যার জনক ছিলেন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)। তাঁর হাত ধরেই ইসলামে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার সূত্রপাত ঘটে সিফফিনের যুদ্ধের মাধ্যমে।

আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ঃ

প্রশাসনিক রদবদল

খিলাফতের শুরু হতেই হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ততায় ভরপুর ছিল। কুফায় রাজধানী স্থাপন করে খলীফা অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার অবসান করতে উদ্যোগী হন। তিনি বসরা, কুফা, মিসর ও সিরিয়ার শাসনকর্তাদের রদবদল করেন। এটি মুয়াবিয়া (রা.)এর মত অপরাপর উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি খলীফার এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনীহা

মুয়াবিয়া (রা.) ব্যতীত সকল প্রদেশের শাসনকর্তাগণ খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে নেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) খলীফার প্রতি কোন প্রকার আনুগত্য প্রকাশ করলেন না। তিনি খলীফার ঠিকানাযুক্ত একটি পত্রবিহীন খাম প্রেরণ করলেন এবং ঘোষণা করলেন- যতদিন উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হবে ততোদিন তিনি খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বিরত থাকবেন।

মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ দাবি

খলীফা উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করা ছিল একটি সময়ের দাবি। কিন্তু এটি ছিল একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। কোন একক ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না। বরং এতে কুফা, বস্রা ও মিসরের কতিপয় ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। তাই তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রের এমন বিশৃংখল অবস্থায় হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার করা সম্ভবপর ছিল না। অপরদিকে মুয়াবিয়া (রা.) খলীফা উসমান (রা.) এর রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তৃত আঙ্গুল সিরিয়ার মসজিদে প্রদর্শন করে জনতাকে উত্তেজিত করে তোলেন। তিনি খলীফার কাছে অচিরেই এই হত্যার বিচার দাবি করেন নতুবা তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন এই মনোভাব ব্যাক্ত করেন।

মুয়াবিয়া (রা.) এর উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতা লিপ্সা

মূলত উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ দাবি ছিল মুয়াবিয়ার একটি রাজনৈতিক কৌশল। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী। মুয়াবিয়া হযরত উমর (রা.) কর্তৃক সিরিয়ার গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক,

সংগঠক, কৃতিত্বপূর্ণ শাসক। তার সময়ে ভূ-মধ্যসাগরে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও এশিয়া মাইনরে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তার প্রাদেশিক রাজধানী দামেস্কে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। এতে তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলের জন্য উৎসাহিত হন।

উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব

হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্বে পরোক্ষভাবে প্রাক-ইসলামী যুগের উমাইয়া ও হাশেমী দ্বন্দ্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি বনু উমাইয়া গোত্রভুক্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিমী গোত্রের লোককে ক্ষমতার কেন্দ্রে দেখতে চাইবেন না।

উমাইয়া স্বার্থহানি

হযরত উসমান (রা.) এর শাসনামলে উমাইয়াগণ খলীফার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহু সরকারী সম্পত্তি জায়গীর নিজেদের অধিকারভুক্ত করেছিলেন এবং তা ভোগ করে আসছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) খলীফা হয়ে এই সকল সরকারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এতে উমাইয়া পরিবারের সকল সদস্য মুয়াবিয়া (রা.) সহ তাদের সম্পত্তির অনেকাংশ হাত ছাড়া হয়ে যায় যা ছিল তাদের জন্য ব্যাপক স্বার্থহানি। এটি ছিল তাদের মধ্যকার অন্যতম দ্বন্দ্বের কারণ।

সিফফিনের যুদ্ধ (৬৫৭ খ্রিঃ)

খলীফা হযরত আলী (রা.) এর প্রতি মুয়াবিয়া (রা.) এর আনুগত্য প্রকাশে অনীহা, উসমান (রা.) হত্যার বিচার দাবি ও সর্বোপরি মুসলিম সম্পদায়ের মধ্যে বিভক্তি ইত্যাদি কার্যকারণে মুয়াবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুয়াবিয়া (রা.) এর ধৃষ্টতা ও অবাধ্য আচরণের ফলে ৬৫৭ খ্রিঃ খলীফা একটি বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা শুরু করে। ইতিমধ্যে মুয়াবিয়া (রা.) ৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফফিন নামে স্থানে এসে শিবির স্থাপন করলেন। প্রথমে হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে দূত পাঠানোর মাধ্যমে ইসলামের স্বার্থে খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে আহবান জানান। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) তার সিদ্ধান্তে অটল রইল। তারপর খলীফা হযরত আলী (রা.) অযথা রক্তপাত এড়ানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে মুয়াবিয়া (রা.) কে মল্লযুদ্ধে আহবান জানালেন। কিন্তু শৌর্য-বীর্যের প্রতীক, আল্লাহর বাঘ হযরত আলী (রা) সাথে মল্লযুদ্ধে মুয়াবিয়া (রা.) নিজের প্রাণক্ষয় করতে চাইলো না তাই এই প্রস্তাবও নাকচ করে দেয়া হলো। অবশেষে যুদ্ধ অনিবার্য হয়েও উঠলো। দুই পক্ষ সম্মুখযুদ্ধে পরস্পরকে মোকাবেলা করতে লাগলো। খলীফার সেনাপতি মালিক আল আসতার এর অপূর্ব রণকৌশলে মুয়াবিয়া (রা.) এর বাহিনী ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিবসে মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর সেনাবাহিনীর নিশ্চিত পরাজয় দেখতে পেলেন।

আমর ইবনুল আসের কৌশল ঃ

যুদ্ধে মুয়াবিয়া (রা.) এর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখা দিলো। তাই মুয়াবিয়া (রা.) তার প্রধান সেনাপতি ও উপদেষ্টা, শ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক আমর ইবন আল-আস (রা.) এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। আমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে যুদ্ধের পরাজয় হতে ফিরে আসার জন্য এক অভিনব কৌশল অবলম্বনের উপদেশ দিলেন।

কুরআনের মাধ্যমে মীমাংসা

আমরের পরামর্শে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ তাদের পতাকাশীর্ষে ও বর্শার অগ্রভাগে কুরআন শরীফের পবিত্র পাতা ঝুলিয়ে চিৎকার করে বিরোধীদলীয় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, " এখানে আল্লাহর কিতাব - এটি আমাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করবে।" নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি অভিনব কৌশল। হযরত আলী সেনা বাহিনীর প্রায় সম্মুখভাগের প্রায় সকলেই ছিলেন কুরআনে হাফিয। তাঁরা কুরআনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং হযরত আলী (রা.) কে কুরআনের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য সকলকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান। এই ব্যবস্থা ছিল একটি দূরদর্শী চিন্তার ফসল যা যুদ্ধের মোড়-পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল।

হযরত আলীর যুদ্ধ বন্ধে অনীহা

হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) এর এই কূটনৈতিক চালকে বুঝতে সক্ষম হন। তিনি এই যুদ্ধ বন্ধ করতে কোনভাবেই ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ যুদ্ধে তাঁর জয় ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাঁর সেনাপতি মালিক আল-আসতারও যুদ্ধ স্থগিত করতে আগ্রহী হলেন না। এমন অবস্থায় হযরত আলী (রা.) এর সেনাবাহিনীর একাংশ হযরত আলী (রা.) কে যুদ্ধ বন্ধের জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন এবং একটি সালিশের মাধ্যমে এই সংকটের নিষ্পত্তি কামনা করেন। অবশেষে সকলের একান্ত ইচ্ছা ও চাপে পড়ে হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ স্থগিত করেন।

দুমার মীমাংসা (জানুয়ারী ৬৫৮ খ্রিঃ)

হযরত আলী (রা.) এর সাথে মুয়াবিয়া (রা.) এর যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁরা উভয় দল মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে আপোস করার চেষ্টা করবেন। খলীফা আলী (রা.) কুফার গভর্ণর আবু মুসা আশ্য়ারী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) আমর ইবনে আল-আসকে সালিশে নিস্পত্তি করার জন্য স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয়পক্ষ সালিশের চারশত লোক সাথে নিয়ে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হবেন এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে বিরোধ মীমাংসা করবেন।

দুমাতুল জন্দলের মীমাংসা ও আমরের কৌশল

নির্দিষ্ট দিনে মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল জান্দাল (আজরুহ) নামক স্থানে সালিশের মজলিস বসলো। আমর ইবন আল-আস, মুসা আল আশ্য়ারী (রা.) কে বুঝালেন যে ইসলামের স্বার্থে হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) উভয়কেই নিজ নিজ পদ হতে অপসারণ করতে হবে এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তি কে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে। মূলত সিদ্ধান্ত হয় যে, আবু মুসা হযরত আলী (রা.) কে খিলাফত থেকে অপসারণ ঘোষণা করবেন তারপর আমর ইবন আল-আস তাঁর পূর্ব কথা অনুসারে মুয়াবিয়া (রা.) এর পদ থেকে অপসারণ ঘোষণা করবেন। সরলমনা ও অকপট আবু মুসা বেদীর উপর দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন - " আমি হযরত আলী (রা.) কে খিলাফত হতে পদচ্যুত করলাম। এর পর আমর দাড়িয়ে বললেন, "আমি আলীর পদচ্যুতি অনুমোদন করলাম এবং তদস্থলে মুয়াবিয়া (রা.)কে নিযুক্ত করলাম,"। এই রায়ে খলীফার সমর্থকগণ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। আমরের কূটকৌশল ফলপ্রসূ হলো। উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল।

ফলাফল ঃ

মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা

দুমাতুল জন্দলের মীমাংসা ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি মোড়পরিবর্তনকারী ঘটনা। যার প্রভাব ছিল সদূরপ্রসারী।

খলীফার মর্যাদা লোপ

এই মীমাংসার মাধ্যমে খলীফা হিসেবে হযরত আলী (রা.) এর মর্যাদা লোপ পায়। মুয়াবিয়া, যিনি ছিলেন কেবলমাত্র একজন প্রাদেশিক গভর্ণর ছিলেন। তাঁকে খলীফার সমমর্যাদা দান করা হয়। অথচ মুসলিম জাহানের খলীফার মর্যাদা ছিল সকল কিছুর উর্ধ্বে।

খিলাফত বিভক্তি

এই মীমাংমার পর স্বভাবতই খলীফা হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে খিলাফতকে আপোষ-বন্টন করেন। সিরিয়া, মিসর মুয়াবিয়া (রা.) এর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অপর দিকে হেজায, বস্রা, কুফা ও আরবের অন্যান্য অঞ্চল হযরত আলী (রা.) এর অধীনস্ত থাকে।

মুয়াবিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজতন্ত্র

মূলত এই মীমাংসার মাধ্যমে মুয়াবিয়া (রা.) এর শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উচ্চাভিলাষ বাস্তবে পরিণত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। রাজতন্ত্রের বীজ এই সালিশের মীমাংসার মধ্যেই নিহিত ছিল।

খারিজী সম্প্রদায়

দুমাতুল জন্দলের সালিশের মীমাংসায় হযরত আলী (রা.) এর পক্ষের ১২,০০০ সৈন্যের একটি দল তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে 'হারুরা' নামক গ্রামে জমায়েত হয়। খারিজী মানে দলত্যাগী।

উৎপত্তি ঃ দলত্যাগী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী এই দল খলীফার দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা খারিজ হয়ে অস্ত্র ধারণ করলে তাদেরকে খারিজী বা দলত্যাগী বলা হয়। হারুরায় বসবাস করতো বলে তাদেরকে হারুরী (Harurites) নামেও ডাকা হয়। তারা মানুষের বিচার মানতে অস্বীকার করে এবং প্রচার করতে থাকে যে , "আল্লাহর আইন ছাড়া আর কোন আইন নেই" (লা হুকমাহ্ ইল্লালিল্লাহ)। খারিজী সম্প্রদ্রায়ই ইসলামের সর্বপ্রথম ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল বলে পরিচিত।

খারিজীদের রাজনৈতিক মতবাদ

খারিজীগণ প্রথম দুই খলিফাকে ন্যায় সঙ্গত খলীফা হিসেবে গ্রহণ করেন। ৩য় খলীফা উসমান (রা.) ও আলী (রা.) যেহেতু শত্রুর সাথে মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছিলেন তাই তাঁদের বিরোধিতাকে তারা করেন। তারা উমাইয়া ও আব্বাসী খলীফাদের গ্রহণ করেনি। তারা বংশ, গোত্র নির্বিশেষে সর্বজনীনতার ভিত্তিতে ইমাম বা খলীফা নির্বাচনে পক্ষপাতি ছিলেন। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলো। পার্থিব ভোগ-বিলাস তারা বরদাস্ত করতেন না। তারা ঘোষণা করেন যে- যোগ্যতাসম্পন্ন আদর্শবান ও সৎ যে কোন ব্যক্তি খলীফা হতে পারবেন। এমনকি ভৃত্যও খলীফা হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারবেন। ধর্মের ব্যাপারে তারা ছিল কট্টরপন্থী যারা ইসলামের মূল আদর্শ হতে বিচ্যুত তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার অভিপ্রায় তারা পোষণ করতেন।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধ (৬৫৯ খ্রি)

খারিজীদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব আল-রাবিবী। তার নেতৃত্বে খারিজীগণ যারা তাদের মতবাদের বিরোধিতা করতো তাদের হত্যা করে সর্বস্ব লুটপাট করে নিতো। খলীফা হযরত আলী (রা.) তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। খলীফা নাহরাওয়ান নামক স্থানে খারিজীদেরকে মোকাবেলা করলেন। ১২০০০ মধ্যে মাত্র ১৮০০ জন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। যুদ্ধে খলীফা আলী (রা.) খারিজীদের পরাজিত করলেন। কেউ তওবা পড়ে হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে যোগদান করলো অবশিষ্টরা বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাত বরণ

খারেজীগণ আমর ইবন আল-আস (রা.), মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) কে সকল সমস্যার সৃষ্টিকারী হিসেবে দায়ী করে এবং তাদের হত্যার পরিকল্পনা করে। নির্দিষ্ট দিনে কুফা, সিরিয়া ও মিসরে তারা এই তিন ব্যক্তিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় থাকে। সৌভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট দিনে ফজরের সালাতের সময় আমর অসুস্থতার কারণে মসজিদে হাজির হয়নি। মুয়াবিয়া সামান্য আহত হলেও রক্ষা পেলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) আব্দুল্লা ইবনে মুলজামের বিষাক্ত ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হন (২৪ জানুয়রি, ৬৬১) এবং ৬৬১ খ্রিঃ ২৭ জানুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরই মাধ্যমে খুলাফায়ে রাশিদীনের ৪র্থ খলীফার জীবনাবসান ঘটলো এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফতকালের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

হযরত আলীর ব্যর্থতার কারণ

মূলত উস্ট্রের যুদ্ধের মাধ্যমে আলী (রা.) এর সাথে তালহা (রা.) ও যুবায়ের (রা.) এর মত পার্থক্য ঘটে এবং এই দুই বিশিষ্ট সাহাবীর মৃত্যু হযরত আলী (রা.) এর শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পায়। তিনি তাদের নৈতিক ও সামরিক সমর্থন হারান। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা হতে কুফায় স্থানান্তরের ফলে আলী (রা.) বহুলাংশে মদীনাবাসীর সমর্থন হারান। মদীনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী যা মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠা করে যান ও পূর্ববর্তী ৩ জন খলীফা তাঁর অনুসরণ করেন। তাই হযরত আলী (রা.) বিশিষ্ট সাহাবী ও সুন্নী মুসলিমদের সমর্থন হারান। অন্যদিকে কুফাবাসী ছিল অস্থির প্রকৃতির ও চঞ্চলমতি। বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে হযরত আলী (রা.) তাদের পূর্ণসমর্থন পাননি। অপর দিকে সিরিয়ায় মুয়াবিয়া (রা.) এর শক্ত রাজনৈতিক অবস্থান ছিল। তিনি সবসময় সিরিয়াবাসীর অকুণ্ঠ রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন। যা তার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

সারসংক্ষেপঃ

হযরত উসমান (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন এবং সাথে সাথেই ভ্রাতৃঘাতি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর দ্বন্দ্ব সংঘাতের চূড়ান্ত পরিণতি ছিল সিফফিনের যুদ্ধ। যার নেপথ্যে ছিল মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের বিচার দাবি, প্রশাসনিক রদবদল ও হযরত আমরের কূটনৈতিকচাল। অবশেষে দুমাতুল জন্দলে হযরত আলী (রা.)কে খিলাফত হতে পদচ্যুত করা হয় এবং মুয়াবিয়া (রা.) কে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। যা ছিল খিলাফত ও খলীফার জন্য চরম অপমানকর সিদ্ধান্ত। হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্বের ফলাফল স্বরুপ খারিজী ও শিয়া সম্প্রদ্রায়ের আবির্ভাব ঘটে যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন খলীফার সময়ে সিফফিনের যুদ্ধ হয়?

ক) হযরত উসমান (রা.)
খ) হযরত আলী (রা.)
গ) হযরত উমর (রা.)
ঘ) হযরত আবু বকর (রা.)

২. হযরত আলী সিফফিনের যুদ্ধে পরাজিত হন। কারণ -

ক) শারীরিক দুর্বলতা
খ) যুদ্ধে অনীহা
গ) রাজনৈতিক অদূরদর্শী ছিলেন
ঘ) যুদ্ধে অদক্ষ ছিলেন।

৩. সিফফিনের যুদ্ধের কারণ ছিল-

i) মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ
ii) প্রশাসনিক রদবদল
iii) হযরত আমরের কূটনৈতিক চাল

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii
খ) i, ii, iii
গ) ii, iii
ঘ) i

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ভৈরব পৌর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান দুষ্কৃতিকারীদের হাতে নিহত হন। পরবর্তীতে লোকমান এলাকার চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। ইউনিয়নে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য লোকমান সাবেক চেয়ারম্যানের হত্যাকারীদের বিচার করতে বিলম্ব করেন। এতে অন্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী কৌশলে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিচার বিলম্বিত করার অভিযোগ আন্দোলন শুরু করে।

ক) সিফফিনের যুদ্ধ কতসালে ঘটে? ১
খ) 'দুমাতুল জন্দলের মীমাংসার' বর্ণনা দিন ? ২
গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) উপরোক্ত ঘটনার পর সমাজের অবস্থা সিফফিনের যুদ্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৪

পাঠ-৬.১৭ হযরত আলী (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত আলী (রা.) এর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- হযরত আলী (রা.) এর শাসন সংস্কারের বিষয়ে বলতে পারবেন ও
- হযরত আলী (রা.) চরিত্রের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বিশ্বস্ত নেতা, 'দিওয়ানে আলী', তাসাউফ, আসাদুল্লা উপাধি, যুলফিকার।**

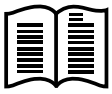

হযরত আলী (রা.) খুলাফায়ে রাশিদীনের চতুর্থ খলীফা ছিলেন। বিপুল তারুণ্য নিয়ে তাঁর ইসলামে আগমন আর সারাজীবনব্যাপী ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগ-তিতীক্ষা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

আলী (রা.)-এর চরিত্র

আলী (রা.) রক্তিম বর্ণ বিশিষ্ট, নাতিদীর্ঘ, অতীব শক্তিশালী, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কোমল কপোতাভ চক্ষুবিশিষ্ট অমায়িক এবং দয়ার দৃষ্টিসম্পন্ন বলে বর্ণিত হয়েছেন। সরল ও একনিষ্ঠ মুসলিম হযরত আলী (রা.) ছিলেন সরলতা ও আত্মত্যাগের মূর্ত-প্রতীক। মুসলিম জগতের খলীফা হয়েও স্বহস্তে কাজ করতে তিনি গর্ববোধ করতেন। তিনি জীর্ণকুটিরে বাস করতেন এবং মোটা কাপড় পরিধান করতেন। দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.) এর আমলে প্রবর্তিত অধিকাংশ জনহিতকর কার্য তাঁর পরামর্শেই সম্পাদিত হয়েছিল। তিনি শান্ত ও পরোপাকারী ছিলেন। ইসলামের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। হযরত আলী (রা.) প্রত্যহ পাঁচবার মসজিদে সালাত পড়তে যেতেন এবং মুসলিম ও অমুসলিমগণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। তরুণদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিশ্বস্ততা ও সততা

তিনি ছিলেন জাতির বিশ্বস্ত নেতা। তিনি সততা ও নিষ্ঠা সহকারে বায়তুল মালের সংরক্ষণ করতেন। নিজের ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত কোন অর্থ বা খাদ্য বায়তুল মাল থেকে নেয়া হারাম বলে মনে করতেন।

জ্ঞানী

হযরত আলী (রা.) শৈশবকাল থেকেই মহানবী (সা.) এর তত্ত্বাবধান সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি যাবতীয় প্রশিক্ষণ লাভ করেন। যৌবনে হযরত (সা.) এর জামাতা হবার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর মধ্যে জ্ঞান আহরণ এবং বহুমুখী জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের সহজাত যোগ্যতা ও আগ্রহ ছিল। এ কারণে নবীর প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কুরআন মাজীদ, তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ, অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়াদির জ্ঞানে তিনি ছিলেন দক্ষ। তাঁর জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে সকলেই একমত ছিল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বাণী "আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার ফটক" এরই প্রমাণ দেয়।

হযরত আলী (রা.) এর কৃতিত্ব ঃ

প্রশাসনিক সংস্কার

হযরত উসমান (রা.) (রা.) শাসনের শেষের দিকে প্রশাসনে উমাইয়াদের যে প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আলী (রা.) পুনরায় তা ঢেলে সাজান এবং প্রশাসনিক সংস্কার করেন। হযরত উসমান (রা.) এর যুগে অসাধু আমলাদের কারণে প্রশাসনে যেসব দূর্নীতি ঢুকে পড়েছিল সেগুলো দূর করে তিনি হযরত উমর (রা.) এর যুগের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা বহাল রেখেছিলেন এবং তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন করেননি। নাযরানের ইহুদিদেরকে উমর (রা.) হিজায থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তারা পুনরায় হিজাযে আগমনের দরখাস্ত করলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

বায়তুল মালের সংরক্ষণ ঃ বায়তুল মালের যথাযথ সংরক্ষণে তিনি সতর্ক ছিলেন। নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের কাজে সরকারী কোষাগারের সাধারণ কোন জিনিসও তিনি ব্যয় হতে দিতেন না। মহানবী (সা.) এর ভৃত্য আবু রাফেকে তিনি বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত করেছিলেন।

বাজারদর পরিদর্শন ঃ পণ্যসামগ্রীর বাজার দর তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতেন। যেন তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়। দোকানদারদেরকে সঠিক মাপ ও ক্রেতার সাথে ভাল ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন।

পাণ্ডিত্য

হযরত আলী (রা.) অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কবি, সাহিত্যিক, বৈয়াকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর লিখিত 'দিওয়ানে আলী' আজও আরবি সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর বক্তৃতা ও অভিভাষণ আরবি ভাষার গৌরবের বস্তু।

উত্তরাধিকার আইন

উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মদীনার অন্যতম বড় পণ্ডিত। বিভিন্ন ধরণের মামলা মুকাদ্দমাতে তাঁর প্রদত্ত রায়সমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধির বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মূল উৎস হিসেবে তাঁর বক্তব্যকেই গণ্য করা হয়।

আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবর্তক

আরবি ব্যাকরণের ভিত্তি হযরত আলী (রা.)-ই স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজের সাথীদের মধ্য থেকে আবুল আসওয়াদ আদ- দুয়াইলী নামক জনৈক ব্যক্তিকে এ কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

বীরত্বের মূর্ত প্রতীক

হযরত আলী (রা.) ছিলেন বীরত্ব ও সাহসিকতার মূর্ত-প্রতীক। তিনি তাঁর অসাধারণ শৌর্য ও সাহসিকতা নিয়ে ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। মহানবী (সা.) জীবদ্দশায় যত যুদ্ধ সংঘটিত হয় তিনি প্রায় সব কটিতেই অংশগ্রহণ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। বদর যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলিমদের পতাকা বহনকারী। উহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, খায়বর প্রভৃতি যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন।

আসাদুল্লা উপাধি লাভ

তাঁর সামরিক কৃতিত্বের মধ্যে খায়বরের বিখ্যাত কামুস দুর্গ দখল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অসাধারণ বীরত্বের নির্দেশন স্বরুপ তাঁকে মহানবী (সা.) 'আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

যুলফিকার লাভ

মহানবী (সা.) যুলফিকার নামক তরবারী তাকে উপহার দান করে বলেন- 'যুলফিকার' সমতুল্য কোন তরবারী নেই এবং আলীর সাথে কোন বীর যোদ্ধার তুলনা করা যায় না।

সারসংক্ষেপঃ

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এর শাসনকাল ছিল নানা সংকট ও সমস্যায় পূর্ণ। তা সত্ত্বেও তিনি তার মেধা, চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ রেখে গেছেন। তিনি প্রশাসনিক দিক থেকে যথেষ্ট সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য অমর হয়ে আছেন। অনুকূল পরিবেশে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এক কথায় খলীফা হিসেবে কিয়ৎ পরিমাণ ব্যর্থ হলেও মানুষ হিসেবে তিনি পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. "আসাদুল্লাহ" শব্দের অর্থ কী?

ক) আল্লাহর সিংহ খ) আল্লাহর বন্ধু

খ) আল্লাহর তরবারি ঘ) আল্লাহর সিপাহী

২. হযরত আলী (রা.) প্রশাসনে সংস্কার সাধন করেন কেন ?

ক) উমাইয়াদের দমন করতে খ) নিজের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করতে

গ) উমাইয়াগণ কর্তৃক সৃষ্ট দুর্নীতি দূর করতে ঘ) কোনটিই নয়

৩. হযরত আলী (রা.) খলীফা হিসেবে যেসকল কাজ করতেন -

i) বাজারদর পরিদর্শন করতেন ii) স্কুল কলেজ নির্মাণ করতেন

iii) বায়তুল মাল যথাযথ সংরক্ষণ করতেন

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i খ) i, ii

গ) i, iii ঘ) i, ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক আবু ইসহাক বললেন 'x' খলীফা ছিলেন ইসলামে শ্রেষ্ঠ বীর। তিনি স্বভাবগত ভাবে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর শাসনকাল বিভিন্ন যুদ্ধের জন্য বিতর্কিত হলেও ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সফল সেনানায়ক। তাঁর মৃত্যুর সাথেই ইসলামী সাধারণতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ক) ইসলামের চতুর্থ খলীফার নাম কী? ১

খ) "হযরত আলী (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত" কথাটি ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত খলীফার বীরত্ব তুলে ধরুন। ৩

ঘ) প্রশাসক ও ব্যক্তি হিসেবে হযরত আলী (রা.) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.১৮ খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন ও
- খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনব্যবস্থার বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

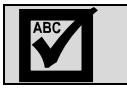	মুখ্য শব্দ	আমিরুল মুমিনীন, মজলিস-উশ-শূরা, সাহিবুল আহ্দাস ও সাহিবুল খারাজ।

মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের পর পর চারজন খলীফা তাঁর প্রতিনিধি হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যকে শাসন করেছেন। এই চার খলীফার শাসন ছিল মহানবী (সা.) আদর্শ নীতির প্রতিকৃতি। মহানবী (সা.) আল্লাহর বাণীকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কিন্তু মদীনা রাষ্ট্রকে একটি শাসনকাঠামো দিয়েছিলেন খুলাফায়ে রাশিদীনের চার খলীফা তাদের ৩০ বছরের (৬৩২-৬৬১) শাসনে মুসলিম সাম্রাজ্য কেবল প্রসারিত হয়নি বরং একটি উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল।

খলীফা

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনব্যবস্থায় খলিফাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.) এর প্রতিনিধি। রাসূল (সা.) এর ন্যায় তিনিও ছিলেন প্রধান ধর্মীয় নেতা, ইমাম, সেনাবাহিনীর প্রধান, আইনদাতা ও রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তা। তাঁর উপাধি ছিল 'আমিরুল মুমিনীন বা মুমিনদের নেতা'। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। কুরআন ও হাদীস অনুসারে খলিফাকে শাসন করতে হতো। তিনি তাঁর কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকতেন, জনগণের নিকট জবাবদিহি করতেন। আল খুযারীর ভাষায়-The khilafat was a temporal headship based on religion.

শাসননীতি

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকাঠামো খলীফা হযরত উমর (রা.) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী খলিফাগণ তাঁর অনুসৃত নীতিসমূহ অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি শাসনক্ষেত্রে ৩ টি প্রধান নীতি অনুসরণ করেছিলেন যা ছিল তাঁর সমগ্র শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্য। যথা-

- তিনি আরব জাতিকে একটি বিশুদ্ধ ও স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি -বৈদেশিক উপাদানগুলো আরবদেশ হতে দূরীভূত করে আরব ভূমিকে কেবলমাত্র আরববাসীদের জন্য সংরক্ষিত রাখেন।
- আরববাসীদেরকে আরবের বাইরে ভূমি ক্রয় করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
- সাধারণতন্ত্রের অতিবিস্তার তিনি পরিহারের চেষ্টা করেন। যতদিন তাঁর এই নীতি প্রচলিত ছিল, ততোদিন পর্যন্ত মুসলিম শাসনকাঠামো অটুট ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরবর্তী খলিফাগণ এই নীতি হতে দূরে সরে পড়েন।

মজলিস-আল-শূরা

মজলিশ-আল-শূরা বা মন্ত্রণা-পরিষদ ছিল খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একে উপদেষ্টা পরিষদও বলা হতো। আনসার ও মুহাজিরদের পক্ষ হতে বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী-ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দ্বারা শূরা গঠিত হত। মসজিদে নববীতে এটির অধিবেশন পরিচালনা বসতো। খলিফাগণ এই মন্ত্রণা পরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেমন- প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ, কাজী, সেনাপ্রধান নিয়োগ, রাজস্ব নির্ধারণ, যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ও শাসনকার্যের নানাবিধ কর্মকাণ্ড মজলিসের পরামর্শ অনুসারে সম্পন্ন করা হতো। খলীফা উমর (রা.) এর শাসনামলে এটি প্রধান ২ টি অংশে বিভক্ত ছিল।

ক) মজলিস-ই-আম বা সাধারণ সভা।

খ) মজলিস-ই-খাস বা বিশেষ সভা।

শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ

খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকার্যে জনগণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে খলীফা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজকর্মচারী ও শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। খলীফা তাঁর কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহিতা করতেন। জনগণের মতামত ও অভিযোগ খলিফাগণ গুরুত্বসহকারে শ্রবণ করতেন।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য খলিফাগণ সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা- মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাবিয়রাহ, বসরা, কুফা, মিসর, ফিলিস্তিন, ফার্‌স, কির্‌মান, খোরসান, মাক্‌রান, সিজিস্তান, ও আজারবাইজান ।

ওয়ালী

প্রদেশের শাসনকার্য ও প্রাদেশিক গভর্ণর বা ওয়ালীর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি শূরার সম্মতিক্রমে স্বয়ং খলীফা দ্বারা নিযুক্ত হতেন। তিনি ছিলেন প্রদেশের ইমাম, সেনা প্রধান, রাজস্ব আদায়কারী ও শুক্রবারে তিনি জুমুআর খুৎবা পাঠ করতেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য খলীফার নিকট দায়ী থাকতেন। তাঁর কাজের জন্য ব্যক্তিগত সেক্রেটারিয়েট (সচিবালয়) ছিল।

আমিল

প্রত্যেকটি প্রদেশকে একাধিক জেলায় বিভক্ত করা হতো। জেলার শাসনভার আমিল নামক কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত ছিল। তিনি ওয়ালীর অধীনে কাজ করতেন। ওয়ালী ও আমিলকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হত। নিয়োগের পূর্বেই তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব রাখা হতো। তাই কর্মরত অবস্থায় তাঁর সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে রাষ্ট্র তা বাজেয়াপ্ত করে নিতো।

অন্যান্য কর্মচারী

খলিফাগণ প্রত্যেক প্রদেশে কাজী নিয়োগ করতেন। কাজীকে উচ্চ শিক্ষিত ও সৎ হতে হতো।
সাহিবুল খারায ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তা।
সাহিবুল আহ্‌দাস ছিলেন প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা।
সাহিবুল বায়তুল মাল ছিলেন বায়তুল মালের প্রধান।

রাজস্ব প্রশাসন

খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে নিম্ন লিখিত উৎস হতে রাজস্ব আদয় করা হত।
১. যাকাত ২. জিযিয়া ৩. খুম্‌স ৪. ওশর ৫. খারায ৬. আল ফাই ৭. উশর।

যাকাত বা দরিদ্র কর

প্রত্যেক সামর্থ্যবান ও বিত্তশালী মুসলিম হতে যাকাত আদায় করা হতো। শরীয়ত মোতাবেক এটির বিধি বিধান স্বয়ং মহানবী (সা.) প্রবর্তন করে গিয়েছেন। সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করার পর পরবর্তীতে খলীফা উমরের সময়ে অশ্বের উপরও যাকাত ধার্য করা হয়।

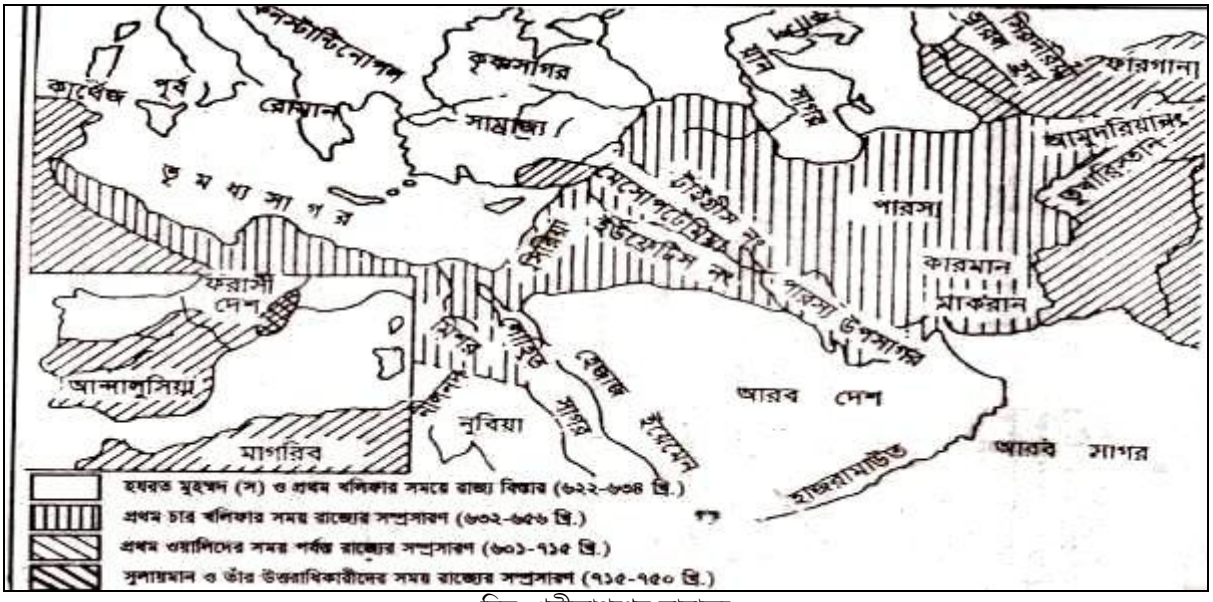

চিত্র: খলীফাগণের সাম্রাজ্য

জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর

মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমগণ রাষ্ট্রের তরফ হতে নিরাপত্তার জন্য জিযিয়া কর প্রদান করতো। তাদের কোন প্রতিরক্ষায় বা সামরিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হতো না। তাই এই কর্তব্য হতে অব্যাহতি ও নিরাপত্তা পাবার জন্য তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, উন্মাদ, ধর্মপরয়াণগণ এই কর হতে মুক্ত ছিলেন। উচ্চবিত্তের জন্য বাৎসরিক ৪ দিনার মধ্যবিত্তের জন্য ২ দিনার ও নিম্নবিত্তদের জন্য ১ দিনার ধার্য করা হয়েছিল।

গানিমাহ

এটি ছিল যুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি। যার ১/৫ (এক পঞ্চমাংশ) ভাগ রাজকোষে জমা হতো। একে বল হত খুম্‌স। বাকি ৪/৫ (চার পঞ্চমাংশ) অংশ সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হতো।

ওশর

মুসলিমগণ তাদের জমি চাষবাস করলে রাষ্ট্রকে ওশর প্রদান করতে হতো। রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত উৎপন্ন শস্যের ১/১০ (এক দশমাংশ) কে আল-ওশর বলা হত। এটি পানি বা সেচ সুবিধাহীন বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি হতে আদায় করা হতো।

খারাজ

খারাজ ছিল অমুসলিম কৃষকদের উপর আরোপিত ভূমিসর। দিওয়ানুল খারাজ নামক বিভাগ রাষ্ট্রের খারাজ আদায় করতো। রাষ্ট্র কর্তৃক এর নির্ধারিত পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক অথবা ৫০% নগদ অর্থ বা উৎপন্ন শস্যের মাধ্যমে তা আদায় কার হত।

আল ফাই

খলিফাদের শাসনামলে দাবিদারহীন খাস জমি, অনাবাদী ও অরণ্যভূমি এবং বিদ্রোহীদের বাজেয়াপ্ত জমি আল ফাই নামে পরিচিত। এই সব জমি হতে প্রাপ্ত আয়কে বলা হয় আল ফাই রাজস্ব।

উশুর বা বাণিজ্য কর

বিদেশি বণিকগণ মুসলিম রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে তাদেরকে ১০% হারে উশুর বা বাণিজ্যকর দিতে হত। মুসলিম বণিকগণ ২.৫ এবং দেশীয় অমুসলিম বণিকগণ ৫% হরে উশুর দিতো।

বায়তুল মাল ও দিওয়ান

খলীফা উমর (রা.) শাসনামলে আরো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ছিল বায়তুল মাল ও দিওয়ান। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে খলীফা বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন। সকল রাষ্ট্রীয় আয় বায়তুল মাল-এ সংগৃহীত হত এবং তা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হতো। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় কোষাগার। খলীফা বায়তুল মাল হতে মাসিক বৃত্তি পেতেন। এর অর্থের উপর তার কোন অধিকার ছিল না।

অপরদিকে রাষ্ট্রের রাজস্বের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য খলীফা দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব নিকাশ করাই ছিল এর প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া ব্যয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ পেনশন বা ভাতা হিসেবে জনগণের মাঝে বন্টন করা হতো। মহানবী (সা.) এর নিকট আত্মীয়, ইসলামের খিদমত ও সমতার ভিত্তিতে ভাতার পরিমাণ নির্ধারিত হতো।

সামরিক শাসনব্যবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে কোন সুনির্দিষ্ট সামরিক বাহিনী ছিল না। যুদ্ধের সময় মহানবীর (সা.) এর আহবানে সকলে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু খুলাফায়েরাশেদীনের সময়ে একটি স্থায়ী সামরিক বাহিনী তৈরি করা হয়। খলীফা উমর (রা.) এর প্রবর্তন করেন। বর্শা, ঢাল, তলোয়ার ইত্যাদি ছিল সামরিক বাহিনীর অস্ত্র। সামরিক অফিসারগণ যোগ্য পারিশ্রমিস পেতেন, তাদেরকে রাষ্ট্র হতে ভাতাও প্রদান করা হতো।

সামরিক সদস্যগণ মূলত ৫ ভাগে বিভক্ত হয়ে (যথা: অগ্র, পশ্চাৎ, মধ্যভাগ, ডান বাহু ও বাম বাহু যুদ্ধ) পরিচালনা করতেন। খিলাফত ৯ টি জুনদ বা সামরিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। সাধারণত দশমিক পদ্ধতিতে- আরিফ, কায়েদ ও আমীর ইত্যাদি ভাগে দিওয়ান-আল-জুন্‌দ বা সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করা হতো।

বিচার বিভাগ

খলিফাই ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারক। এছাড়াও কেন্দ্রে ছিলেন একজন প্রধান বিচারপতি বা কাজী-উল-কুজ্জাত। তিনি নিরপেক্ষ ও আদর্শ বিচারক হতেন। প্রাদেশিক কাজীদের তিনিই নিয়োগ করতেন। কাজী কুরআন হাদীস অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

নৌ-বিভাগ

আরব উপদ্বীপের ৩ দিকেই ছিল সমুদ্র। প্রথম দুই খলীফার সময় পর্যন্ত আরব- নৌবাহিনী গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়নি। ৩য় খলীফা হযরত উসমান সর্বপ্রথম নৌ-বাহিনী গঠন করেন। আব্দুল্লাহ বিন কায়েস ছিলেন প্রধম আরব নৌ-অধ্যক্ষ। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে ৫০ টি নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময় হতে লোহিত সাগর, ভূ-মধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগরে আরব নৌবাহিনীর প্রাধান্য সৃষ্টি হতে থাকে।

পুলিশ বাহিনী

খলীফা হযরত উমর (রা.) পুলিশ বিভাগ বা শুরতা প্রবর্তন করেন। সাহিব আল শুরতা ছিলেন এই বিভাগের প্রধান। পুলিশ বাহিনী রাত্রিকালে পাহারা দিতেন ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন।

জনহিতকর কার্যাবলি

খলিফাগণ প্রজাদের জনকল্যাণের জন্য কৃষির উন্নতি সাধন করেন। এই উদ্দেশ্যে বহু খাল খনন করেন, জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। আমর ইবন আল-আস মিসরে সুয়েজ খাল খনন করেন। অনাবাদী জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলেন। এছাড়াও খলীফাগণ রাষ্ট্রীয় ভবন, মসজিদ, দফতরখানা, কারাগার, সরাইখানা, পরিবহন, সড়ক ইত্যাদি নির্মাণ করেন।

ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা

খলিফাগণ ছিলেন প্রধান ধর্মীয় নেতা। তাঁরা কুরআন ও হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রেরণ করতেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা

সাধারণত মসজিদই ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। খলীফাদের শাসনামলে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো। এই সময়ে বস্‌রা ও কুফা মুসলিমদের প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়।

জিম্মী

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজাদের নিরাপত্তা দেওয়া হতো। তারা নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীন ছিল। তারা সকল প্রকার মৌলিক অধিকার ভোগ করতো। রাষ্ট্র কেবল সামর্থ্যবান যিম্মীদের কাছ হতে জিযিয়া কর গ্রহণ করতো। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে যিম্মীগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতো।

সামাজিক জীবন

খুলাফায়েরাশেদীনের যুগে সামাজিক জীবন ছিল অত্যন্ত শৃংখল। খলিফাগণ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। সমাজে কোন সামাজিক স্তর বা শ্রেণি ভেদাভেদ ছিল না।সমাজে নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নারীরা সমাজের পুরুষের সম-মর্যাদার অধিকারী হন। তারা স্বামী ও পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। সমাজে দাসদের প্রতি সুবচার করা হতো ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হতো। দাসদের অনেকেই উচ্চ পদে আসীন হতে পারতো।

সারসংক্ষেপঃ

প্রায় দুই যুগের অধিক (৬৩২-৬৬১) খ্রিঃ সময় ধরে খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন বজায় ছিল। মূলত ২য় খলীফা হযরত উমর (রা.) ছিলেন এই ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রকৃত সংগঠক। তার শাসনকাঠামোই পরবর্তী খলিফাগণ অনুসরণ করে গেছেন। এই শাসনব্যবস্থা ছিল স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক জনগণের ইচ্ছা ও মতামত এই শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হতো। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, সামরিক, বিচার, শিক্ষা, অর্থ-রাজস্ব, সকল দিক থেকে এই শাসন ব্যবস্থা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা। যা ছিল পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসীয় এবং সমগ্র বিশ্বের শাসকদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. খুলাফায়ে রাশিদীনের চার খলীফার শাসনকাল কত বছর ছিল ?

ক) ৪০ বছর খ) ৩০ বছর গ) ২০ বছর ঘ) ৬০ বছর

২. খলিফাগণ সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন কেন ?

ক) অতিরিক্ত কর আদায়ের জন্য খ) জনসংখ্যার হিসাবের জন্য

গ) শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ঘ) কোনটিই নয়

৩. খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে নিম্নলিখিত উৎস হতে রাজস্ব আদায় করা হত-

i) যাকাত ii) জিযিয়া iii) আল ফাই

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i, ii খ) ii, iii গ) i, iii ঘ) i, iii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'ক' এর শাসনামল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই শাসনব্যবস্থা ছিল স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, সামরিক, বিচার, শিক্ষা, অর্থ-রাজস্ব সকল দিক থেকে এই শাসন ব্যবস্থা ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা যা পরবর্তী সকল শাসকের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

ক) খুলাফায়ে রাশিদীনের সদস্য কারা? ১

খ) মজলিশ-আল-শূরা বলতে কী বুঝ? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসন ব্যবস্থার প্রাদেশিক শাসন পদ্ধতি আলোচনা করুন। ৩

ঘ) খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলো আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ :	১. (গ)	২. (গ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ :	১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ :	১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ :	১. (গ)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ :	১. (গ)	২. (ক)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ :	১. (ঘ)	২. (খ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ :	১. (ঘ)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮ :	১. (গ)	২. (ক)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯ :	১. (খ)	২. (খ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০ :	১. (গ)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১১ :	১. (ক)	২. (খ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১২ :	১. (ক)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৩ :	১. (খ)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৪ :	১. (খ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৫ :	১. (খ)	২. (ক)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৬ :	১. (খ)	২. (গ)	৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৭ :	১. (ক)	২. (গ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৮ :	১. (খ)	২. (গ)	৩. (ঘ)